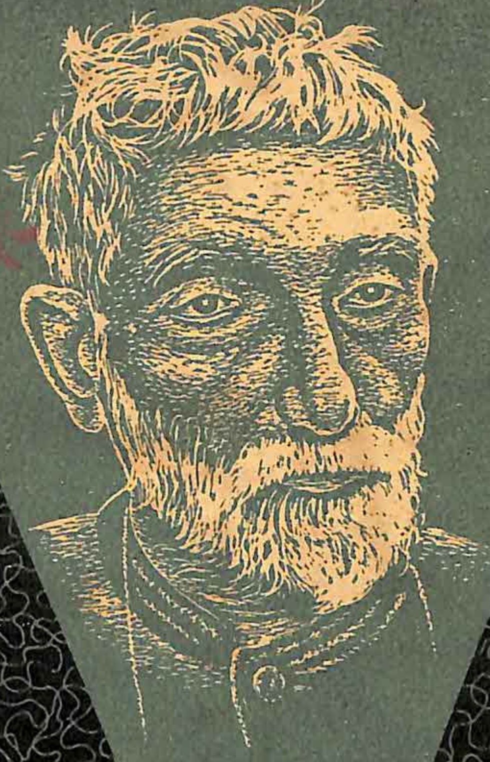


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র — — — —
— — — — জীবনী ও বাণী

'বীরত্বে বাঙালী', 'ব্যায়ামে বাঙালী', 'বাংলার মনীষী', 'বাংলার ঋষি',
'আচার্য জগদীশ—জীবনী ও আবিষ্কার' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্. এ.-প্রণীত

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মূল্য ১'৫০

তৃতীয় সংস্করণ

Published by A. C. Ghosh, Presidency Library, 15 College Square, Calcutta. Printed by A. C. Ghosh, Sree Jagadish Press, 41 Gariahat Road, Calcutta-19.

ভূমিকা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী ও দেশকর্মী। তাঁহার বিচিত্র কর্মবহুল জীবন-কথা সংক্ষেপে ও সহজে লিখিত হইল। প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে এই গ্রন্থের 'বাণী' সংকলিত হইয়াছে। যাঁহাদের পত্রিকা ও গ্রন্থাদি হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আশা করি, এই গ্রন্থখানি বাঙালী পাঠকদের নিকট যথাযোগ্য সমাদরে গৃহীত হইবে। ইতি

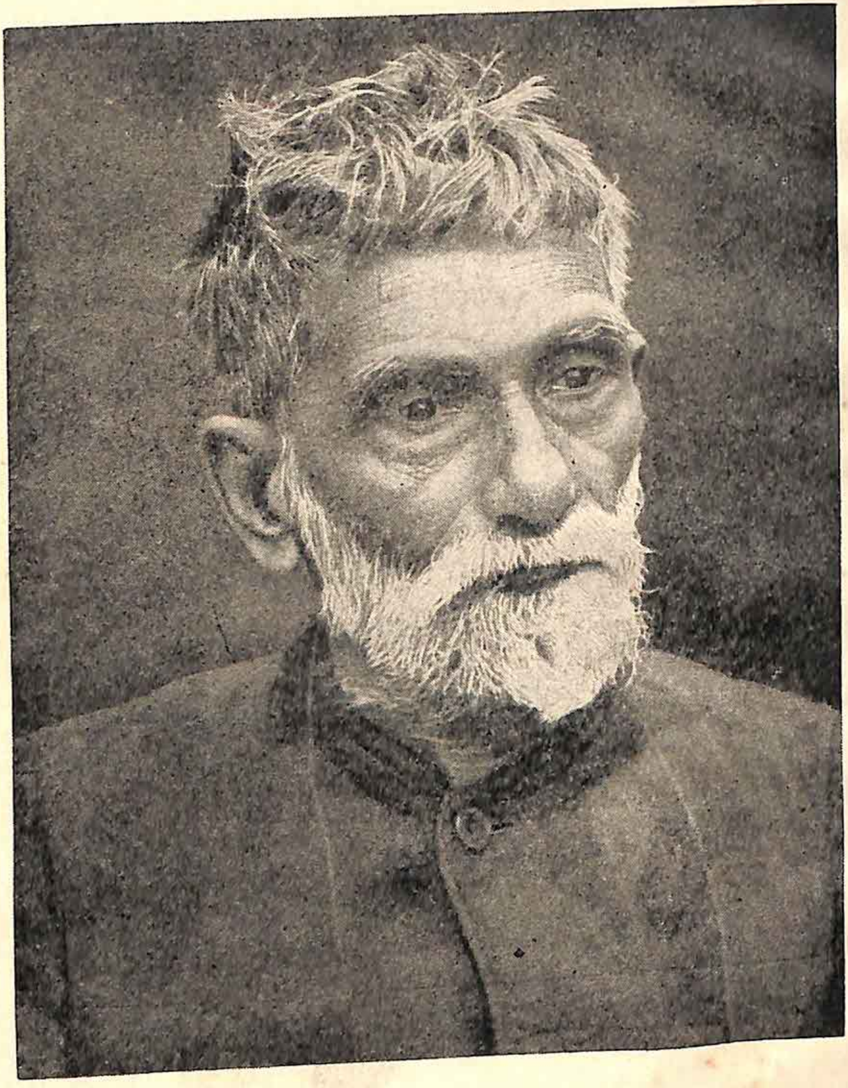
আশ্বিন
১৩৫৮

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

সূচীপত্র

জীবনী

বাণী



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বাল্যকথা ও ছাত্রজীবন

"আমাদের এখন শ্রমশীল হওয়া চাই, অদম্য উৎসাহ চাই, সাহস ও ধৈর্য চাই—মোটের উপর খাঁটি মানুষ হওয়া চাই। কঠিন সমস্যাসকল মীমাংসা করিবার ভার আমাদের হাতে, আমাদের কি চাকুরীপ্রিয়, দুর্বলচিত্ত, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হ'তে হবে, দৃঢ়ব্রত হ'তে হবে, মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মানুষ হ'তে হবে।

"একটি সবল জীবন্ত যুবকসমাজের দরকার হইয়াছে। গণ্ডীছাড়া স্বাধীন শিক্ষা লাভের জন্য উৎসুক, কর্মোৎসাহে চিরনবীন যুবক সম্প্রদায় চাই; তাহারাই এদেশকে নূতন করিয়া গড়িবে, নূতন মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে।"—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

খুলনা জেলার রাড়ুলি-কাটিপাড়া নামক একটি ছোট গ্রামে ১৮৬১ সালে শ্রাবণ মাসে প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রাড়ুলি গ্রামখানি কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত। কপোতাক্ষ বাংলার কবির লেখনীতে অমর হইয়া রহিয়াছে। ইহারই তীরবর্তী আর একখানি গ্রাম মাইকেল মধুসূদনের জন্ম-নিকেতন।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র রায় উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। পারস্য ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন—হাফিজ ও সাদীর অনুপম কবিতা তাঁহাকে অপরিসীম আনন্দ দিত। এদিকে কৃষ্ণনগর কলেজে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রিচার্ডসন সাহেবের নিকট ইংরাজী সাহিত্যও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নিজের গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি নিজ বাসভবনে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেকালের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। স্বর্গীয়

রাজা দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, শিশির কুমার ঘোষ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা তাঁহার পিতার স্কুলেই আরম্ভ হয়। পরে এই স্কুলটির পরিচালনার ভার প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই লইয়াছিলেন। কিছুদিন গ্রামের স্কুলে পড়িবার পর হরিশ্চন্দ্র ছেলেপেলেদের সুশিক্ষার জন্য কলিকাতায় যাইয়া বাস করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। প্রায়ই শেষরাত্রে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া লেখাপড়া করিতেন। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও বড় একটা নিয়ম-কানুন মানিতেন না—এই সকল কারণে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। তিনি দুরন্ত আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়া পড়েন। ইহার ফলে তিনি স্কুল ছাড়িয়া দেন। তাঁহাকে বাড়ীতেই বসিয়া থাকিতে হয়।

এই সময়ে তিনি বাড়ীতেই বেশ পড়া-শুনা করিতেন। তাঁহার পিতার একটি ভাল লাইব্রেরী ছিল। তাহার অনেক বই কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র বাসায় বসিয়া এই বইগুলি পড়িয়া ফেলেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি তাঁহার ঝোঁক আসে। শেষ পর্যন্ত তিনি এই দুই বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। সেই যে তাঁহার ছাত্রজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি সেই ছাত্রই রহিয়াছিলেন। শত কর্ম-কোলাহলেও তাঁহার অধ্যয়ন-সাধনার বিরাম ছিল না। এমন অধ্যয়নশীল তপস্বী কমই দেখা যায়। নিজের কথা তিনি লিখিয়াছেন—"জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি

আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব কৈশোর যৌবন কখন চলে গেছে বুঝ্‌তে পারিনি। আজ বার্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু'ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত।"

দুই বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্র নিরাময় হইয়া আলবার্ট স্কুলে ভর্তি হইলেন। সেকালে আলবার্ট স্কুলের খ্যাতি ছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের ছোটভাই কৃষ্ণবিহারী সেন ইহার রেক্টর ছিলেন। তিনি চমৎকার ইংরেজী পড়াইতেন। এই স্কুলে ব্রাহ্ম শিক্ষকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠেন। এই সময়কার কথা তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন।—

"আমি চির-রুগ্ন। আলবার্ট স্কুলে তখন কেশব সেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুন্‌তাম। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন স্কুলের সর্বময় কর্তা। তিনি ইংরাজী পড়াতেন; তাঁর মত ইংরাজী ভাষার শিক্ষক আজও দুর্লভ। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম। হকারের দোকান থেকে লাটিন ও ফ্রেঞ্চ বই কিনে পড়্‌তাম। বঙ্গদর্শন আগাগোড়া পড়া যেত।"

এই সময়ে কেশব সেনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছেলেদের উপর অসাধারণ। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় যুবকদল মাতিয়া উঠিত। তাঁহাকে সকলে দেবতার মত ভক্তি করিত। প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁহার

প্রভাব যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। আলবার্ট স্কুলের ছাত্রজীবনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আর একদিন বলিয়াছিলেন—

"সেখানে (আলবার্ট স্কুলে) প্রত্যেক শনিবার কেশব সেনের বক্তৃতা হ'ত। তিনি এক সময় বলেছিলেন—বাঙালী ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিসের খোলে তূলো পূরে দেওয়া—কেবল ঠাসো আর গাদো।"

স্বর্গীয় কেশব সেনের এই অমূল্য কথা তিনি বৃদ্ধ বয়সেও ভোলেন নাই। তাই একথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

"তার উপর অভিভাবক সর্বনাশ করছেন—স্কুলের ছুটি হলেই মাষ্টারবাবুকে ছেলের পেছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্যে শিখবে। এরা হচ্ছেন murderer of boys অর্থাৎ বালকহন্তা, কারণ স্কুলের ছুটির পর অন্ততঃ দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোট, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা বাও—তবে ত স্বাস্থ্য থাকবে, মনে প্রফুল্লতা আস্‌বে।"

প্রফুল্লচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজে এফ্-এ ক্লাসে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে একদিকে যেমন ব্রাহ্ম আন্দোলন দেশে একটা সারা আনিয়াছিল, অন্য দিকে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জাতীয় জীবনে এক নব চেতনার সঞ্চার হইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। ফরাসী বিপ্লবের কথা উদ্দীপনাময়ী ভাষায় যখন এই তেজস্বী বাগ্মীবরের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত তখন সকলে রোমাঞ্চিত ও স্তব্ধ হইয়া শুনিত। অমন

বাগ্‌বিভূতি পৃথিবীর ইতিহাসে কমই দেখা গিয়াছে। শুধু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্যই প্রফুল্লচন্দ্র মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্তি হইয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িবার সময় প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক স্যর জন ইলিয়ট ও স্যর আলেকজাণ্ডার পেডলারের নিকট যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৮৮০ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য-সম্পদ্ কোন দিনই প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল না। অথচ রোগা শরীর লইয়াই তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কত পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এই দুর্বল ও রুগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কি করিয়া এত পড়া-শুনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলিতেছি—

"কিন্তু পড়তে হবে নিয়মিতরূপে, অর্থাৎ প্রতিদিনকার কর্তব্য-বোধে সময়ের সদ্ব্যবহার করা চাই। ধারাবাহিকরূপে কাজ করা চাই। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে পাথরও ক্ষয় হয়। অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত – ধ্যান-ধারণার সমতুল্য! ঠাকুর ঘরে যখন কেউ উপাসনায় নিরত থাকেন, তখন পাছে ধ্যানভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেউ তাঁকে বাধা দিতে যায় না। সেইরূপ কেউ অধ্যয়ন বা চিন্তানিরত থাক্‌লে, তাঁকে কোন মতে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়।"

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হওয়াতে এ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এই

সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাতে যাওয়ার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি যখন বি-এ পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে 'গিলক্রাইষ্ট স্কলারশিপ' (Gilchrist Scholarship) নামক বৃত্তি লাভ করিলেন। এই বৃত্তির টাকায় তিনি বিলাতে পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি উক্ত বৃত্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই বছরই বিলাত যাত্রা করিলেন। তখনও তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই ইংরাজী সাহিত্য ও ইতি-হাসের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু তিনি এডিনবরায় পৌঁছিয়া বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বুঝিয়া-ছিলেন, ভারতের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে এ যুগে বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। কাজেই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বি-এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে পি. জি. টেইট ও সি. এ. ব্রাউন নামক দুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। প্রফুল্লচন্দ্র এই দুই বৈজ্ঞানিকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বিজ্ঞান-চর্চায় বিশেষতঃ রসায়নশাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠেন। ১৮৮৫ সালে তিনি বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইহার পর দুই বছর পরে রাসায়নিক গবেষণা কার্য করিয়া ডি-এস্‌সি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই গবেষণা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি হোপ প্রাইজ (Hope Prize) নামক একটি বিশেষ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই টাকা পাওয়াতে তিনি আরো ছয় মাস এডিনবরায় থাকিয়া তাঁহার আরব্ধ গবেষণা কার্য আরো কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি একটি ব্যাপারে বেশ নাম করিয়াছিলেন। তিনি 'India before and after Mutiny' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। উহাতে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বের ও পরের ভারতবর্ষের অবস্থার কথা অতি সুন্দর ইংরাজীতে চমৎকারভাবে লিখিয়াছিলেন। উহাতে একাধারে তাঁহার ভাষাজ্ঞান ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি অনেকের নিকটই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল।

অধ্যাপনা ও আবিষ্কার

"If I could for a moment command the organ voice of Milton I could exclaim that we are of a Nation not slow and dull, but of a quick, ingenious and piercing spirit, acute to invent, subtle and sinewy to discourse, not beneath the reach of any point the highest the human capacity can soar to."

—Sir P. C. Roy.

প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া চাকুরীর জন্য চেষ্টা করেন এবং ১৮৮৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই চাকুরী পাইতে তাঁহাকে কম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই। সে সময়ে বিজ্ঞান-চর্চা ছেলেদের মধ্যে খুবই কম ছিল। বিজ্ঞানের বইগুলি মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশই সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিজ্ঞান-চর্চায় যথার্থ অনুরক্তি ছিল না বলিলেই চলে। বিজ্ঞানের জন্য জীবন পণ করিয়া সাধনা করা তখনকার দিনে ছেলেদের ধারণায় আসিত না। মৌলিক গবেষণাদ্বারা নব নব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ আবিষ্কারের স্পৃহা যাহাতে ছেলেদের মধ্যে জাগ্রত হয় প্রফুল্লচন্দ্র এই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। তিনি নিজেও কলেজের লেবরেটারীতে নূতন নূতন গবেষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিজ্ঞান-চর্চায় বিশেষ প্রতিবন্ধক হইল—কলেজে উপযুক্ত লেবরেটারীর অভাব।

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাসায় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিলাতে ছাত্রাবস্থায়ই আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল।

বসু-পত্নী মহাশয়ের স্নেহে ও যত্নে প্রফুল্লচন্দ্রের একটি বছর বড়ই সুখে কাটিয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র ছেলেদিগকে দরদ দিয়া ভালবাসিতেন এবং তাহাদের উন্নতির জন্য সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। ছেলেরাও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। শুধু কলেজের পাঠ্য বইতেই তাঁহাদের উপদেশ আবদ্ধ থাকিত না। ছেলেরা যাহাতে মানুষ হইয়া কর্ম-জীবনে সাফল্যলাভ করিতে পারে সে জন্যই তিনি সর্বদা উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। তিনি কত সময়ে বলিতেন—

"পড়তে হবে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সহিত, নইলে কোন কাজ হবে না। বাঙালী ছাত্রের প্রধান শত্রু—পড়বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ করলে গল্প আস্‌বেই—অন্ততঃ অতর্কিত ভাবে আস্‌বে। আর বাঙালীর প্রধান বিপদ হচ্ছে আড্ডা।

"তোমরা অনেকেই য়ুনিভার্সিটির ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হও, সেটা ভাল; কিন্তু আমাদের দেশের অপযশ। কারণ পাশের পর তোমরা হও নষ্ট-স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াজীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণদৃষ্টি। কিন্তু এই পাশ না করতে পারলেই আমাদের ছেলেদের মুখ আঁধার। এ অবস্থায় থাক্‌লে চল্‌বে না, এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ; এপথ থেকে ফির্‌তেই হবে।"

"মোটকথা এই, যে ছেলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের বাহিরে যত খবর রাখিবে আমি সেই ছেলেকে তত বাহাবা দিব। অর্থাৎ যে শিক্ষার দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ হয় ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।"

১৮৯৫ সাল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে এক স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর তাঁহার দীর্ঘ দিবসের গবেষণার ফলস্বরূপ মারকিরাস নাইট্রেট্ (Mercurous Nitrate) আবিষ্কৃত হইল।

ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। তরলীকৃত (dilute) নাইট্রিক এসিডের (Nitric Acid) সংস্পর্শে পারদের গায়ে হরিদ্রাভ বর্ণের সঞ্চার অনেকেই ইতঃপূর্বে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেও প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থসৃষ্টির আভাস দিল। ঠাণ্ডাবস্থায় উক্ত এসিড প্রয়োগে পারদ হইতে তিনি হরিদ্রাবর্ণ মারকিরাস নাইট্রেট্ (Mercurous Nitrate) প্রস্তুত করিলেন। প্রথিতযশা রাসায়নিকমণ্ডলী বাঙালী রাসায়নিকের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পারদ-জাত যৌগিক পদার্থ-নিচয়ের একটি শূন্যস্থান পূর্ণ হইল।

১৯১২ সালে লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহা-সম্মেলন (Congress of the Universities of the Empire) হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং যোগ্যতার সহিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রদের সমর্থন করিয়াছিলেন। ডার্হাম বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে ডি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের কার্যকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন যথাক্রমে মিঃ পেডলার (পরে স্যার), মিঃ পি. মুখার্জি, মিঃ ষ্টেপল্টন ও মিঃ কানিংহাম। ১৯১১ সালে কানিংহাম সাহেবের মৃত্যুর পর আচার্য রায় রাসায়নিক বিভাগের

প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান-চর্চায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার জন্য ১৯১০ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (Science Congress) তাঁহাকে সভাপতির পদে বৃত করেন। সেই সভায় তিনি "বর্তমান ভারতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

১৯১২ সালে স্যর তারকনাথ পালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পনের লক্ষ টাকা বিজ্ঞান-চর্চার জন্য দান করেন। পর বৎসর স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও এই উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ টাকা দেন। এই অর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র এই সময়ে বিলাতে ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রফুল্ল-চন্দ্রকে অনুরোধ জানাইলেন যে, বিজ্ঞান কলেজের পালিত-প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক অধ্যাপকের পদ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯১৬ সালে গভর্নমেণ্টের অনুমতি-ক্রমে প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদে নিযুক্ত হন। পরবৎসর তিনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তারপর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি এই বিজ্ঞান কলেজে অক্লান্তভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্য করিয়াছিলেন।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস

"I confess, as a Hindu, the subject of Hindu chemistry has always had a fascination for me." —Sir P. C. Roy

"আমি যখন হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম তখন একবার দুরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসর ভুগি। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। এই দুই বৎসর বাধ্য হইয়া আমাকে বাড়ীতে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এই সময়ে ল্যাটিন, ফরাসী ইত্যাদি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি। বঙ্গদর্শনে রামদাস সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে প্রত্নতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ লিখিতেন আমি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সেই অল্প বয়সে আমার মনে ঐ যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল তাহা বহুকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় গুপ্ত থাকিয়া হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস লিখিবার সময় পুনর্বার প্রকাশিত হয়।"

প্রফুল্লচন্দ্রের এই কথা হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহার অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি বাল্যকাল হইতে সজাগ ছিল। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের' (History of Hindu Chemistry) কথা বলিব। ১৯২০ সালে এই বিরাট গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লেখার

প্রেরণা তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, সে কথা নিজেই বলিয়াছেন—

"পৃথিবীর প্রাচীন জাতিরা রসায়নশাস্ত্রে যতদূর পারদর্শী হয়েছিলেন তাহা অবগত হইতে আমার চিরকাল কৌতূহল আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে যখন আমি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলাম, তখন হইতে টমসন্, কপ্ প্রভৃতি মনীষিগণের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ আমার প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই সময় ভারতবাসিগণ রসায়নশাস্ত্রে কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্য আমার মনে স্বতঃই অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা জাগরূক হয়। এই নিমিত্তই আমি 'চরক' 'সুশ্রুত' প্রভৃতি আয়ুর্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যাহা কালের কবলে অবলুপ্ত হয় নাই, তাহা লইয়া রাসায়নিকের দিক্ হইতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।"

এই বিরাট কার্যে তিনি যে মনীষীর সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন তিনিই বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে বার্থেলো। তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য লিখিয়াছেন—

'এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রায় একুশ বৎসর পূর্বে আমি মঁসিয়ে বার্থেলোর সংশ্রবে আসি। এই ঘটনা আমার ঐতিহাসিক রসায়নশাস্ত্র পাঠের পথনির্দেশক স্বরূপ। যিনি প্রতীচ্য জগতের রসায়নশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং কোন্ স্থান হইতে তত্রত্য লোকেরা ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল তাহা সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সেই তৎকালীন রাসায়নিকদিগের অধিনেতা জগদ্বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক, হিন্দুগণ রসায়নশাস্ত্রে কিরূপ উন্নতি করিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য

1034

উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার এই সংকল্পে প্রণোদিত হইয়া আমি 'রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রেরণ করি। পরে দেখিতে পাই যে, ঐ গ্রন্থের কোন বিশেষত্ব নাই, কারণ উহাদ্বারা হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তির হেতু অবগত হওয়া যায় না। বার্থেলো যে ঐ গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার মধ্যযুগে রসায়নশাস্ত্র নামে তিন খণ্ড বিশাল গ্রন্থ আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ প্রধানতঃ আরব ও সিরীয় গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত। আমি কিন্তু তখনও উহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত ছিলাম না। উহা অধ্যয়ন করিবার পর হিন্দু রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে একখণ্ড পুস্তক লিখিয়া ঐ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিবার উচ্চ আশা আমার মনে উদিত হয়।"

কিন্তু এই গ্রন্থ লিখা সহজ কার্য ছিল না। বিশেষতঃ ইহার সমুদয় উপাদান হস্তলিখিত কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথিপত্র ব্যতীত আর কোথাও পাইবার সম্ভাবনা ছিলনা। এই সকল পুঁথিপত্রও একত্র সংগৃহীত ছিল না অথবা কোথায় আছে তাহাও জানা ছিল না। পুরাণ পুঁথি ঘাটিয়া নূতন বই লিখাই কত যে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের আবশ্যক, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। কোথায় মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, কোথায় বারাণসী, কোথায় কাটামুণ্ড, তিব্বত সকল জায়গা হইতে প্রাচীন পুঁথি সকল আনীত

হইল। এইরূপে প্রচুর মালমসলা সংগ্রহ করিয়া সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার পর এই বিরাট গ্রন্থ জনসমাজে প্রচার হইল। এই গ্রন্থের উপসংহারে আচার্য লিখিয়াছিলেন—

"It is with mingled feelings that I mark the hour of my final deliverance from a self-imposed task which has occupied all my spare time during the last 15 years and more, feelings not unlike those which overpowered the Historian of the Roman Empire.

"The Hindu nation with its glorious past and vast latent potentialities may yet look forward to a still more glorious future, and if the perusal of these lines will have the effect of stimulating my countrymen to strive for regaining their old position in the intellectual heirarchy of nations, I shall not have laboured in vain."

হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম খণ্ডে রসায়নী বিদ্যা চারি যুগে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম আয়ুর্বেদিক যুগ—বৌদ্ধপূর্ব যুগ হইতে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট প্রভৃতি এই যুগের গ্রন্থ। দ্বিতীয় পরিবর্তন যুগ—৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ; বৃন্দ ও চক্রপাণি এই যুগের গ্রন্থ। দ্বিতীয় পরিবর্তন যুগ—৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ; বৃন্দ ও চক্রপাণি এই যুগের গ্রন্থ। তৃতীয় তান্ত্রিক যুগ—১১০০ খৃষ্টাব্দ

হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ ; রসার্ণব এই যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। চতুর্থ যুগ—১৩০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৫০ খৃঃ অব্দ ; রসরত্নসমুচ্চয় এই যুগের প্রামাণ্য গ্রন্থ। দ্বিতীয় খণ্ডে অনেক নূতন উপাদান সংযোজিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত রাসায়নিক সিদ্ধ নাগার্জুন ও তৎপ্রণীত 'রসরত্নাকর' ভারতের জ্ঞানবৈভব বর্ধিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ হিন্দু রসায়নে যে অসাধারণ উন্নতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। এমন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও হিন্দু রাসায়নিক গোবিন্দাচার্য 'রসসার' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হিন্দুগণ রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং উহা এই দেশের মাটীতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে বার্থেলো এবং প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্ সিলভ্যাঁ লেভি এই গ্রন্থের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড ১৯০৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় এবং ইহার দুই বছর পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

নব্য বাঙলার রাসায়নিক গোষ্ঠী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সবচেয়ে বড় দান ও কৃতিত্ব বাংলা দেশে তাঁহারই শিক্ষা-দীক্ষায় একদল নব্য রাসায়নিকের সৃষ্টি। বস্তুতঃ আচার্যদেবের আর কোন কৃতিত্ব না-ও যদি থাকিত, তবু শুধু এই একটি মাত্র কীর্তি-গৌরবে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিত। আচার্যদেবের ছাত্রগণ যথার্থই তাঁহার সাধনার উত্তরাধিকারী—তাঁহাদের অনেকের কৃতিত্ব আচার্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। দেশ-বিদেশে প্রফুল্লচন্দ্রের খ্যাতি তাঁহার ছাত্রদের কৃতিত্বের জন্যই শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার প্রথম অবস্থায়ই চাহিয়াছিলেন, একদল যথার্থ অনুসন্ধিৎসু ছাত্র যাঁহারা বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় জীবনপাত করিবেন। ইহার জন্য দীর্ঘদিন তিনি প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯১০ সাল হইতেই তাঁহার এই আশা সার্থক হইতে চলিল। এই সময়েই শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রমুখ ছাত্রগণ আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের 'নির্জন লেবরেটরী মুখরিত করিয়া তুলিল।' তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক অতুলচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী ও মাণিকলাল দে, ডাঃ জ্ঞান রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডাঃ পুলিন সরকার, ডাঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ

বিশেষ খ্যাতি ও যশ অর্জন করিয়াছেন। ডাঃ রসিকলাল দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নী বিদ্যায় সর্বপ্রথম ডি-এস্‌সি উপাধি লাভ করেন। যখন ইনি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, তখনই আচার্য রায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গবেষণা কার্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেন। আচার্য রায়ের বহু আবিক্রিয়া ও গবেষণা তাঁহার ছাত্রদের সহযোগে সম্পন্ন হইয়াছে।

তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে ডাঃ নীলরতন ধর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ রসায়নশাস্ত্রের সর্বাধ্যক্ষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি, ডাঃ পুলিন সরকার, ডাঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ অধ্যাপকগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যাপক, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। ডাঃ হেমেন্দ্র কুমার সেন রাঁচি লাক্ষা ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। ইনিই এই পদে সর্বপ্রথম ভারতীয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

"ব্যবসা কর, শিল্প ধর, চাকরীর মায়া ছাড়"

"আজ এই ভীষণ অন্নসমস্যার দিনে আমাদের যুবকগণ কি শুধু পাশ-ফেল গণনা করে জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাগ নষ্ট করে ফেলিবেন? চাকুরী হ'ল না বলে জগৎ অন্ধকার দেখবেন? এ মোহ ছাড়িয়ে উঠ্‌তেই হবে। আমাদের এখন একটা সবল জীবন্ত যুবক-সমাজের দরকার হয়েছে, যারা গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে একটুও ভয় পাবেন না, পাশ-ফেলের হিসাব না রেখে যাঁরা আপনার তেজে আপনি দীপ্ত হ'য়ে প্রচণ্ড কর্ম-চেষ্টা প্রকট করে দেখাবেন।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

প্রফুল্লচন্দ্র যেমন একদিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, অন্যদিকে বিজ্ঞানকে কার্যকরী করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ। বাঙালীর আর্থিক দুরবস্থা ও উহার প্রতীকারের জন্য আচার্য রায় কত না বক্তৃতা করিয়াছেন, কত না প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও তাঁহার ইহাতে বিরাম ছিল না।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকুরী করিয়া ২৫০৲ টাকা পান। উহা হইতে মাসে মাসে তাঁহার পৈতৃক ঋণ শোধ করেন, উদ্বৃত্ত সামান্যই থাকে। এইরূপে ৮০০৲ টাকা সঞ্চিত হইল। এই সামান্য পুঁজি সম্বল করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডের এক ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে অধুনা-বিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"The Bengal Chemical and Pharmaceutical Works had its birth and early struggles in the dark

and dingy rooms of a house in Upper Circular Road, and it started with the modest sum of Rs. 800."

প্রথম অবস্থায় বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রকে 'কুলির মত' খাটিতে হইত। কত অনটন ও দুর্ভাবনার মধ্য দিয়া ইহার শৈশবকাল কাটিয়াছে। আচার্য রায় লিখিয়াছেন—

"আমার প্রিয় বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বর্তমান মূলধন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। ৩০ বৎসর পূর্বে উহা মাত্র ৮০০৲ টাকা লইয়া আরম্ভ করি। একদিন আমার ছোট ভাইর উপর চিনি কিনিবার ভার দিই। সে শ্যামবাজারের এক ডাক্তারখানার বিলের টাকা হইতে বড়বাজারে গিয়া চিনি সওদা করিবে, তবে আমি সিরাপ প্রস্তুত করিব। ট্রামের ভাড়া ৪ পয়সা জুটিল, এক পয়সা জুটিল না। তখন এমনই অভাবে দিন গিয়াছে। আর এখন?" আবার বলিয়াছেন—

"তখন সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হ'ত, নিজেদের সুখ ও স্বাস্থ্যের দিকে একটুও নজর দেবার অবকাশ ছিল না। আর আমাদের সময় কারও কাছ থেকে কোন রকম উৎসাহ পাবার সুবিধা ছিল না,—বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে কেউ কখনও উৎসাহ দিত না। এখন অনেক পরিবর্তন ঘটেচে—এ-বছর আমাদের কারখানার একজন বৈজ্ঞানিক এক লাখ টাকা কেবল রয়েলটি হিসাবে পেয়েছেন। তিনি আগুন নেবাবার একটা যন্ত্র (Fire Extinguisher) নতুন ভাবে তৈরী করেছেন, এই Fire King গভর্নমেণ্ট বেশী পরিমাণে নেওয়াতে আমরা তাঁকে এক লাখ টাকা

পুরস্কার দিয়ে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান রাখতে পেরেছি।”

সেই দুঃসময়ে যাঁহারা বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম অবস্থায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। বস্তুতঃ তাঁহাদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সাহায্য না পাইলে বেঙ্গল কেমিক্যাল আজ এই উন্নতি লাভ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই সকল নীরব কর্মীর মধ্যে ডাঃ অমূল্যচরণ বসুই সর্বপ্রথম প্রফুল্লচন্দ্রের সাহায্যে নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাহার পর সতীশচন্দ্র সিংহ নামক একজন যুবক এম্-এ পাশ করিয়া ইহাতে যোগদান করেন। ইনি বস্তুতঃই বিজ্ঞান-যজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করেন। একদিন হাইড্রোসায়েনিক এসিড্ (প্রুসিক এসিড্) লইয়া কার্য করিবার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী প্রেসিডেন্সী কলেজে ডিমন্‌ষ্ট্রেটার ছিলেন, তিনিও আসিয়া ইহাতে যোগ দিলেন। তাঁহার মত একনিষ্ঠ ও নীরব কর্মী খুব কমই দেখা যায়।

আমাদের একটা জাতীয় কলঙ্ক আমাদের চাকুরী-প্রিয়তা। ইহার ফলে বাঙ্‌লার ব্যবসা-বাণিজ্য আজ পরের হাতে। বাঙ্‌লার কোটি কোটি টাকা আজ শোষণ করিয়া লইতেছে ইংরাজ, আর্মেনিয়ান, ভাটিয়া ও মাড়োয়ারী বণিকের দল আর আমরা হা অন্ন, হা অন্ন বলিয়া ক্ষুধার জ্বালায় ছুটাছুটি করিতেছি।

প্রফুল্লচন্দ্র এই দৈন্য দূর করিয়া আবার এই শ্যামলা বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বেঙ্গল

কেমিক্যাল ছাড়া তিনি আরো ৫।৭টি যৌথ কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কতবার বলিয়াছেন—

"ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রধান জিনিষ প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা, কোন অসুবিধাতেই দমে না যাওয়া এবং অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে কোন চল্‌তি কারবারে শিক্ষানবিশী করা। এমন যুবক নেই যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'লে কৃতকার্য হ'তে না পারেন। এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।'

"আমাদের দেশের লোক শ্রমের মর্যাদা বুঝেন না। এই জ্ঞানটা আমাদের বড় কম। 'পরিশ্রম করলেই ছোট লোক হ'ল' এরূপ একটা ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। আমি সেই যুবকটিকে ধন্যবাদ দিই যিনি বলেন কুলিগিরি কর্‌ব; এঁর বাহাদুরী আছে। 'বসে খাব বা কারও স্কন্ধে চেপে খাব'—এ বড় লজ্জার কথা—বড় জঘন্য কথা। যে অলস, যে পরভাগ্যোপজীবী তাঁর বেঁচে থাকবার অর্থ নেই।

"আমাদের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে টাকার অভাব। কোন সভা-সমিতিতে ভলান্টিয়ারের অভাব হয় না—কিন্তু যথার্থ কষ্ট স্বীকার করে যে কাজ করতে হয়, সেইখানেই আমরা লোকাভাব দেখি। আমাদের উৎসাহ খড়ের আগুনের মত দপ্‌ করে জ্বলে উঠে, কিন্তু আবার খপ্‌ ক'রে নিবে যায়। এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস কর্মপঙ্গুত্ব আনয়ন করে। ভাবপ্রবণ হও, খুব বড় কল্পনা কর, ভাবুকতার বলে গতানুগতিকের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেল, নূতন পথে এগিয়ে চল। অলসতা ও সুখপ্রবণতাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় দুর্বলতা। এখন আমাদের আত্মবিশ্বাস চাই, পরস্পরের

প্রতি বিশ্বাস চাই, আমাদের প্রতি বিশ্বাসের উপযুক্ত হওয়া চাই।

"মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। অন্নসমস্যার মীমাংসা কর্‌তে পার্‌লে সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া আমার অন্য কিছু বল্‌বার নাই। এসব কাজে আমাদের স্পৃহা নেই, প্রবৃত্তি নেই। এই প্রবৃত্তি আগে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে, এই স্পৃহা মনে তীব্র হ'লে নূতন পথে চল্‌বার সাহস হবে।

"তারপর বাঙালী কখনও অংশীদারীতে কাজ করতে পারে না। বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে, যদি সে অংশীদার নিয়ে কাজ আরম্ভ করে তবে অনেক সময় হিতে বিপরীত হ'য়ে দাঁড়ায়—কাজ শিখে নিয়ে অংশীদার পালায়। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে যৌথ কারবারেও বাঙালীর চেষ্টা সফল হয় না। এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় দোষ।

"আমাদের অনেকে প্রথম উদ্যমে ব্যবসায়ে প্রবেশ ক'রে অল্পদিনের মধ্যে সফলতা লাভের জন্য অধীর হ'য়ে উঠেন। আর যদি প্রথমে কিছু লোকসান হয় ত অমনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে 'হা চাকরী, হা চাকরী' ক'রে বেড়ান। কিন্তু স্থিরভাবে লেগে থাক্‌তে না পার্‌লে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সফলতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। তাঁরা বোঝেন না যে লোকসান দিয়ে তাঁরা বরং দক্ষ হ'লেন। আসল মাঝি সেই, যে পদ্মা পার হয়েছে, মাথার উপর দিয়ে যার অনেক ঝড়ঝাপ্টা গেছে। ঝড়ঝাপ্টা না পোহালে কোন কাজই হয় না। হতাশ হওয়া একেবারেই ঠিক নয়। তোমরা হতাশ

হয়ো না—তা' হলেই লোকসান যাকে বল্‌ছ তার মধ্যে লাভ দেখ্‌তে পাবে। পাঁচবার ধাক্কা খেয়ে তবে শিক্ষা লাভ হয়।"

বাঙালী যুবকদের এই কর্তব্য নির্দেশ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের যুবকগণ বসিয়া থাকিলে অথবা নির্জীবভাবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ-ফেল গণনা করিলে চলিবে না। দেশে ছোট-বড় অনেক চাকুরে লোক আছে, তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি করা কখনও যুবকদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। এ আশা, এ মায়া ত্যাগ করিতেই হইবে।

"যুবকগণ গৃহের শত দৈন্য প্রভৃতিতে অকালে ভারাক্রান্ত হয়ে উদ্যম-শক্তি হারিয়া ফেলে। স্যাড্‌লার বলেছেন যে তিনি বাঙালী যুবককে হাস্‌তে দেখেন নাই। আশ্চর্য হবার কথা নয়।"

কয়েক বছর পরে বেঙ্গল কেমিক্যালকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। সেই সময়ে স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ডাঃ চুণীলাল বসু প্রভৃতি এই কারবারে পরিচালকরূপে যোগদান করেন। তখন কোম্পানীর মূলধন করা হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। এখন ইহার মূলধন পঁচিশ লাখের উপর। এখন বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রকাণ্ড কারখানা মাণিকতলায় ১১ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। এই কারখানায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, পানিহাটিতে ১৯১৯-২১ সালে ১৫০ বিঘা জমির উপর নূতন কারখানা খোলা হইয়াছে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল বাঙালীর সংহত প্রচেষ্টার কীর্তিস্তম্ভ। ইহার পরিচালনা সম্পূর্ণ বাঙালীরাই করিয়া থাকেন। ইহার কারখানার ভূতপূর্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও

সুপ্রসিদ্ধ। তিনি আচার্য রায়ের প্রাক্তন ছাত্র। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তিনি যে অপূর্ব হাস্যরহস্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহা অপূর্ব দান। বেঙ্গল কেমিক্যালের সুন্দর সুন্দর নামের পরিকল্পনা ইনিই করিতেন। ইহার অন্যতম পরিচালক শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাত্মাজীর আহ্বানে খদ্দর ও কুটীর-শিল্প প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এখানে রাসায়নিক গবেষণা কার্যে একদল বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত আছেন—তাঁহারা প্রত্যেকেই বি-এস্-সি বা এম্-এস্-সি বা ডক্টরেট উপাধি-প্রাপ্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারত গভর্নমেণ্টকে যুদ্ধের নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেন। এই সাহায্যের জন্য এবং বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার জন্য গভর্নমেণ্ট প্রফুল্লচন্দ্রকে 'স্যর' উপাধি প্রদান করেন। এই দুই কারখানায় বর্তমানে প্রতিদিন ২০ টন করিয়া সালফিউরিক এ্যাসিড্ তৈরী হয়। আলকাতরা ডিষ্টিলেশন্ বিভাগে ন্যাপথলিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পানিহাটি কারখানায় হীরাকস, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, সোডিয়ম, ডাইক্রোনেট, জিঙ্ক ক্লোরাইড্, ইথর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দৈনিক ৩০ টন অ্যালাম তৈরির একটি বিরাট প্ল্যাণ্ট পানিহাটিতে বসিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সিরাম, ভ্যাকসিন্ ও ইনজেকশন্ দিবার বিবিধ ঔষধপত্র মাণিকতলা কারখানায় তৈরি হয়। প্রত্যেক বিভাগেই অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকগণ কার্য পরিচালনা করেন। এখানের রিসার্চ লেবরে-টরীতে গবেষণা করিয়া শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ও শ্রীসতীন্দ্র জীবন দাসগুপ্ত প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট্ উপাধি লাভ করেন। গত ২৫ বছরে বেঙ্গল কেমিক্যালের মাল বিক্রয় বার্ষিক ২৩ লক্ষ টাকা হইতে দেড় কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছে। বর্তমানে ৪০০০ লোক বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানায় কাজ করে।

জনহিত ও সমাজ-সেবা

'হিন্দুধর্ম দেশাচারে, লোকাচারে পরিণত। ধর্ম এখন আশ্রয় নিয়েছেন—জলের কলসী ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

'জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করে নিজে বাড়বে? শরীরকে অনশনে রেখে মস্তিষ্ক বড় হবে? তা কি সয়? সয় না। তাই কি অধঃপতন!"

—ডি. এল্. রায়

"India must wake up, shake off her degradation, put life and heart into every class of her people, elevate her women and depressed classes and remove the galling restrictions of cast and all social inequalities."

—Sir P. C. Roy.

প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল কর্ম-বহুল জীবন, তাঁহার কাজের অন্ত ছিলনা। এই ক্ষীণ দেহ-যষ্টি লইয়া তিনি নানা কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকিতেন। দেশের এমন বৃহৎ জনহিতকর ব্যাপার ছিল না যাহার সঙ্গে তিনি সংলিপ্ত না ছিলেন।

১৯২১ সালে খুলনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, অর্থাভাবে অন্নাভাবে দলে দলে লোক মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সরকার তদন্ত করিতে পাঠাইলেন। সরকার পক্ষ থেকে রিপোর্ট বাহির হইল—খুলনায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই; এখনও সেখানে গরুর দুধ পাওয়া যায়, লোকের ঘাসপাতা খাইতে হয় না! কিন্তু খুলনাবাসী প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট সে স্থানের শোচনীয় অন্ন-কষ্টের কাহিনী প্রত্যহ আসিতে লাগিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'রিলিফ কমিটি' করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর জন্য চাঁদা তুলিতে আরম্ভ

করিলেন। তিনি টাকা তুলিয়া নিরন্ন দেশবাসীর সহায়তা করিলেন।

এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন দেশময় প্রবল বেগে চলিতেছে। চরকা ও খদ্দরের বাণী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে। আচার্য রায়ের চরকা ও খদ্দরে তখন কোন আস্থা ছিল না। কিন্তু খুলনার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কমিলে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের কি কাজ দেওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিতে করিতে চরকা ও খদ্দরের কথা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারী অবসর সময়ে চরকার সূতা কাটিলে ও কাপড় বুনিলে, তাহাদের অনেক সাহায্য হইবে। ইহাই স্থির করিয়া তিনি ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করিলেন। তাঁহার অদম্য চেষ্টা ও উৎসাহে খুলনায় এই মৃত শিল্পটি যেন প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠিল। দিনরাত সে চরকার ঘর্‌-ঘরানিতে মনে পড়ে—

"ভোমরায় গান্‌ গায় চরকায়, শোন্‌ ভাই।
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই!
ঘর-বার কর্‌বার দর্‌কার নেই আর,
মন দাও চর্‌কায় আপ্‌নার আপ্‌নার।
চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর ঘর!
ঘর ঘর ক্ষীর সর,—আপনায় নির্ভর!"

ইহার পর ১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গে ভীষণ বন্যা হয়। রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামগুলি একেবারে ভাসিয়া যায়। লোকের ঘর-বাড়ী, গরু-বাছুর, শস্য সমস্ত নষ্ট

হইয়া গেল। লোকে হাহাকার করিতে লাগিল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, এই বন্যায় ১৮০০ বর্গ মাইল জায়গা ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহাতে ৪০।৫০ জন লোক মারা যায়, ১২ হাজার গরু বন্যায় ভাসিয়া যায়। দেশবাসীর এই দারুণ দুরবস্থায় প্রফুল্লচন্দ্র কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? তাঁহারই উদ্যোগে বন্যা নিবারণের জন্য 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠিত হইল। সমগ্র বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা তোলা হইল। ধনী, গরীব, কুলি-মজুর সকলেই সাধ্যানুসারে সাহায্য করিল। এইরূপে প্রায় সাত লক্ষ টাকা উঠিল। আচার্যের অধিনেতৃত্বে বাংলার যুবকগণ দলে দলে এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিল। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে নানাস্থানে কেন্দ্র করিয়া লোকদের চাউল, জামা-কাপড় ও অর্থ সাহায্য করা হইল। তারপর যখন জল কমিয়া গেল, তখন রোগ দেখা দিল। ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদি লইয়া যুবকদল অগ্রসর হইল। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইল, কিন্তু এই সব লোকেদের কাজ কি দেওয়া যায়? এবারও চরকা বিতরণ করা হইল। লোকেও উৎসাহে সূতা কাটিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের কাটা সূতায় তৈরী খদ্দর বাজারে খ্যাতি লাভ করিল।

হিন্দুসমাজের আজ নানা বিপদ, অনেক সমস্যা। যে সকল ব্যাধি এই সমাজে পুষ্ট হইতেছে, তাহা দূর করিতে হইবে। তবেই হিন্দুসমাজ নিরাময় ও শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইবে। নচেৎ এই দুর্বল ও পঙ্গু সমাজদেহ লইয়া জগতে টিকিয়া থাকা আজকার দিনে আর চলিবে না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এদিকেও দৃষ্টি দিয়াছেন। কত বক্তৃতায়, লেখায়, পুস্তিকায় তিনি এই সকল বিষয়ে সকলকে

উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারের এই প্রচেষ্টার জন্য তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্রই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন—

"তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু একথা যেন না ভোলেন যে যদি তাঁহারা তাঁহাদের অশিক্ষিত দেশভ্রাতাগণকে চণ্ডাল, অন্ত্যজ, পঞ্চমা প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধানে অভিহিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমগ্র হিন্দু জাতির উন্নতির আশা সমূলে নাশ করিবেন।" এই কথাই আমাদের কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

এই তথাকথিত অনুন্নত সমাজের প্রতি সমাজের কর্তব্য কি, তাহা প্রফুল্লচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন—

"আমাদের কর্তব্য, যারা পশ্চাৎপদ তাদের সকলকে টেনে তুলি। আমরা দেশকে মা বলি। যাঁরা লম্বা বক্তৃতা করেন, আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা যদি বাঙলাকে মা বলেন, তবে কি সকলকে ভাই বলে আলিঙ্গন কর্‌বেন না—মায়ের সন্তানকে দূরে ঠেলে তাঁরা অগ্রসর হবেন?—তবে তাঁহাদের কিসের মা বলা?

"সবাই মায়ের সন্তান—সকলকে টেনে নিতে হতে। যে পেছনে আছে তাকে তুলতে হবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন।"

তারপর নারীসমাজের সমস্যা তাঁহার মনে জাগিয়াছে। নারী জাতির উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় পঙ্গুতা দূর হইবার নয়। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"এই যে একই সমাজের স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে একটা বিপুল ব্যবধান—ইহাই আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। It is the woman of India who really belong to the depressed class—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত জাতিভুক্ত। মাতৃজাতির অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য সামর্থ্য আমাদের নাই—কোন্ মুখে আমরা স্বরাজ লাভের যোগ্য বলি ?"

অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের আর এক দূরপনেয় কলঙ্ক। রাষ্ট্র-নেতা মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই ইহার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আন্দোলন চালাইয়াছেন। চল্লিশ বছর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন—

"যে ধর্ম গরীবের দুঃখ বোঝে না, মানুষকে উন্নত করে না, তাহা ধর্ম নামের যোগ্য নহে। আমাদের ধর্ম এক্ষণে কেবল ছুঁৎমার্গে পরিণত হইয়াছে—কাহাকে ছুঁইতে পারা যায়, কাহাকে ছুঁইতে পারা যায় না, তাহারই বিচারে পরিণত হইয়াছে। হা ঈশ্বর! যে দেশের সর্বপ্রধান পণ্ডিতগণ ডান হাতে খাইব না বাঁ হাতে খাইব এইরূপ কঠিন সমস্যার মীমাংসায় গত দুই হাজার বৎসর ব্যস্ত আছেন, সে দেশের অধঃপতন হইবে না ত হইবে কাহার ?"

প্রফুল্লচন্দ্র সে কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"এ ভণ্ডামি আর চল্‌বে না। বরফ খাব, সোডা খাব, ষ্টীমারে বাবুর্চির রান্না খাব, সাহেবের হোটেলে খাব, আবার নামাবলীও ঠিক রাখব, তা হয় না। এই ছুঁৎমার্গের হাত এড়াতে না পারলে হিন্দুধর্ম পৃথিবী হতে লোপ পাবে। এসব ছাই-পাঁশ দূরে ফেলে দিয়ে, হিন্দুজাতিকে বক্ষ বিস্তার করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে; নোংরা দেশাচার পাপাচার আঁকড়ে থাক্‌লে চলবে না।"

সাহিত্য-সাধনা ও জাতীয় শিক্ষা

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?" —নিধুবাবু

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক হইলেও সাহিত্য-চর্চা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রচেষ্টা। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুরাগী ভক্ত। হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস তাঁহার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের বড় নিদর্শন—যদিও উহা ইংরাজীতে লিখা। তাঁহার বক্তৃতাসমূহ সারগর্ভ ও জাতীয় জীবন গঠনের উপাদানে পরিপূর্ণ। তাঁহার লেখাগুলির অধিকাংশই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের, সামান্য কিছু শিক্ষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' ও 'অন্নসমস্যা'—তাঁহার এই পুস্তিকা দুইখানি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। উহা হইতে অনেক কথা এই পুঁথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধারাবাহিক ভাবে প্রফুল্লচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন। 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ধারা' নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইহার পরিচয় দেয়। প্রফুল্লচন্দ্র রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের (১৩১৫ সালে) সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বাংলায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য যাহাতে সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করে, তিনি এই সভায় বিশেষভাবে বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা যতদিন স্বাধীন ভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না।" প্রফুল্লচন্দ্র অনেক

মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন। 'বঙ্গবাণী' 'প্রবাসী' 'বসুমতীতে' তাঁহার অনেক চিন্তাশীল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশে যাহাতে সুশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষা প্রসারিত হয়, তাহার জন্যও প্রফুল্লচন্দ্র কম করেন নাই। ১৯২২ সালে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান করেন। ১৯২৫ সালে যখন তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হইয়া বক্তৃতা দিতে যান, সে উপলক্ষে পারিশ্রমিক বাবদ সমুদায় টাকা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করেন। আচার্যের বয়স ষাট বছর পূর্ণ হইলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করেন। কারণ তিনি যে 'পালিত' অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই পালিত ট্রাষ্টের নিয়ম অনুসারে অধ্যাপকের ষাট বৎসর পূর্ণ হইলে কর্মত্যাগ করা দরকার। অবশ্য ট্রাষ্টিরা ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগ-পত্র পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার কর্মকাল আরও পাঁচ বছর বাড়াইয়া দিলেন। এই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও জ্ঞান-বিস্তারের আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমার জীবনের বাকী দিনগুলি বিজ্ঞান-মন্দিরে কাটাইয়া দিতে খুবই ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অক্ষম। সেই জন্য আমার নিবেদন যে পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক এক হাজার টাকা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করিতেছি, যাহাতে এই টাকা বিজ্ঞান-মন্দিরে রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হইতে পারে।"

দেশে যাহাতে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার হয়, প্রফুল্লচন্দ্র তজ্জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। জাতীয় শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ (National Council of Education) স্যর আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁহাকেই সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

দেশের যেখানে কোন জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অমনি ডাক পড়িয়াছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের। তিনিই এই নূতন যজ্ঞের পৌরোহিত্য করিয়াছেন, তবেই অনুষ্ঠান শুদ্ধ হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে। ১৯২৩ সালে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আহ্বান করেন, উপাধি-দান সভার সভাপতিত্ব করিতে। সে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি একবার বলিয়াছিলেন—"মুসলমানগণ আমাকে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কয়দিন পরে আবার সবরমতী গুজরাট বিদ্যাপীঠে— যেখানে মহাত্মার আশ্রম—তাহার ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য আহূত হই। বাংলা দেশেও যত জাতীয় বিদ্যালয় সব স্থান হইতে আহ্বান পাই।"

আলিগড়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতামন্ত্র হওয়া উচিত যা স্যার আশুতোষ বলিয়াছিলেন— Freedom first, freedom second, freedom always.

চরকা ও খদ্দর

আরাম-প্রিয় বিলাসে নিমজ্জিত আমাদের দেশের বুদ্ধিমান্‌রা জিজ্ঞাসা করেন, 'দেশের জন্য আর কি করিব ?' আমি বলি 'কি করিয়াছ ? খদ্দর পর, পরাও।'

খদ্দর পরার অর্থ শুধু খদ্দর পরিধান করা নহে, যে পরিবারে খদ্দর ঢুকিয়াছে সে পরিবারে এক নূতন আলোক প্রবেশ করিয়াছে, খদ্দর মানসিক পরিবর্তন আনে।

প্রতি বৎসর শোণিতসম ত্রিশকোটি টাকা বস্ত্রের জন্য দরিদ্র দেশ (বঙ্গ) হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে—ইহার নিবারণে প্রত্যেকে সাহায্য করিবেন।

"খদ্দর আমাদের বাঁচন কাঠি, খদ্দর আমাদের দেশাত্মবোধের প্রতীক।"

পূর্বেই বলিয়াছি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রথমে চরকায় বড় একটা বিশ্বাস করিতেন না। খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তরবঙ্গ বন্যার পর চরকার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে তিনি উপলব্ধি করেন। কিরূপে তিনি খদ্দরের ভক্ত ও প্রচারক হইয়া দাঁড়াইলেন, সেই কথা নিজেই বলিয়াছেন—"যখন আমি খদ্দরের প্রচার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আরো অনেকেরই মত আমি খদ্দরের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমার শিষ্য ও বন্ধুবর্গের সহিত ক্রমাগত আলোচনার ফলে বুঝিতে পারিলাম, খদ্দর শুধু রাজনীতিক মুক্তি সাধনের অস্ত্র নহে,—খদ্দর মানবজীবনের সহজ সরল গতির মূর্ত প্রকাশ, ন্যায় ও সত্যের দ্বিধাহীন সঙ্কোচহীন আবরণ।"

তারপর হইতেই চরকা ও খদ্দরের জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বাংলা দেশে খদ্দরের উৎপাদন ও প্রচলন তাঁহারই উৎসাহে ও প্রেরণায় এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ কয়েক বৎসর যাবৎ খদ্দরের জন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা দেখিয়া, অনেকেই

প্রশ্ন করিয়াছিলেন—ডাঃ রায় কি বিজ্ঞান-চর্চা ভুলিয়া গিয়াছেন, এখন তিনি খদ্দরের ব্যাপারী? এই কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, —"অনেকে বলেন যে আমি এখন তাঁত, চরকা, তানা, নলী নিয়ে থাকি এবং রসায়নশাস্ত্র ভুলে গেছি, কিন্তু গত দুই বৎসরে স্বাধীন গবেষণামূলক আমার যত প্রবন্ধ বেড়িয়েছে তেমন জীবনে হয় নাই। আমি রাত্রিতে মোটেই পড়ি না, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ভিতর ১০ ঘণ্টা বাদ দিলেও বাকী ১৪ ঘণ্টায় কত কাজ করা যায়।"

গত অসহযোগ আন্দোলন কালে যখন সমস্ত ভারতে খদ্দরের পুনরুত্থান হইল, সেই সময়ে বাংলার মান রাখিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি আজীবন বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ারে ৫৬০০০্ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই সমুদায় টাকা তিনি খাদি প্রচারের জন্য দান করিলেন। কলিকাতার নিকটবর্তী সোদপুরে 'খাদি প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বদেশী ব্রতের উপকরণ যোগাইল। চারিদিকে প্রফুল্লচন্দ্রের কীর্তি ঘোষিত হইল। বাস্তবিক পক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র যাহা আঁকড়াইয়া ধরেন, তাহাই সফল করিয়া তুলেন। এমন মনের বল কম লোকেরই দেখা যায়।

খাদি প্রচারে আচার্যের এই কার্যে একান্ত নিষ্ঠার সহিত জীবন পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের তাঁহার প্রাক্তন সহকর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়। বস্তুতঃ তাঁহাকে খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ বলিলেই চলে।

যুবকদিগের প্রতি উপদেশ ও অনুপ্রেরণা

প্রফুল্লচন্দ্র চিরকুমার ছিলেন। বাংলার তরুণদলই তাঁহার সন্তানের স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া আসিয়াছে। ছেলেদের তিনি যেমন ভালবাসিতেন, ছেলেরাও তাঁহাকে তেমন শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। তাই যখনই ছেলেরা তাঁহাকে ডাকিয়াছে, তিনি তখনই তাহাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ১৩৩১ সনে সিরাজগঞ্জ ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতিরূপে সত্যই তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি যে সকলে টেনে এনে আজকার সভাপতি পদে আমাকে বরণ করেছ। ছাত্রেরা ডাক্‌লে আমি না সাড়া দিয়ে থাক্‌তে পারি না, তাহারা ভবিষ্যতের আশা, তাদের দিকে চেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সেও বেঁচে আছি। বাঙালী ছাত্রদের দ্বারা অসাধ্য সাধন হবে—শুধু যোগ্য নেতার অভাব, পরিচালকের অভাব। উপযুক্ত নেতা থাক্‌লে কি হতে পারে তা জগলুল পাশা, কামাল পাশার কথায় বলেছি।"

আর একবার এমনতর কথাই ছাত্রদের বলিয়াছিলেন—"এতকাল আমি বাংলার ছাত্রসমাজের মধ্যে বাস করে আস্‌ছি, ছাত্রদের যা আনন্দ, আমারও সেই আনন্দ, তাদের যা দুঃখ আমারও সেই দুঃখ। তাদের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখের আমি অংশীদার। তাই তোমরা ছাত্রবৃন্দ, যখন আমায় আহ্বান করলে তখন আমি তোমাদের কথা না শুনে থাক্‌তে পারলাম না। আমি ছাত্রবর্গে পরিবৃত হ'য়ে থাকি ব'লে, জরাবার্ধক্যেও শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় ভুলে যাই।"

বাংলার যুবক ও নব্য চীন

"যুবকেরাই জাতির প্রাণ—জাতির জীবনশক্তি। তাই আশা হয় বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার হইবে না। যে দেশে বিধির বিধানে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সেই দেশের যুবকেরা মহাপুরুষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ত্যাগ ও বীরত্বে বাঙালী জাতিকে উজ্জ্বল করুন—ঈশ্বরের শক্তি যেন তাহাদের জীবনের পথে চির সহায় হয়।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

দেশের এই যুবকদল—ছাত্রদল, ইহারাই যে জাতির সমস্ত সমস্যা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-বিষয়ক সকল কিছু সমাধান করিতে পারিবে, ইহা আচার্য দেব মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি চীনের ইতিহাস হইতে চীনা ছাত্রদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বাংলার ছাত্র-সমাজকেও এই কার্যে প্রেরণা দিয়াছেন। নব্যচীনের জাগরণ বাংলার জাতীয় জীবনের পক্ষে মস্ত-বড় শিক্ষার বিষয়। নব্যচীনের কথায় আচার্য বলিয়াছেন,—

"এই নবজাগরণের ফলে ১৯০৬-০৭ সালে বিশ হাজাব চীনা ছাত্র শিক্ষার্থিরূপে জাপানে উপস্থিত হইল—দলে দলে চীনা ছাত্র য়ুরোপ ও আমেরিকা ছাইয়া ফেলিল। কি করিয়া জন্মভূমির দুর্দশা ঘুচিবে, কি ভাবে নবীন চীন সভ্য জগতে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিবে, সকলেই এই এক মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই বিশ হাজার ছাত্রের অধিকাংশই অতি দরিদ্র—সারাদিন কুলীগিরি করিয়া, জুতা সেলাই করিয়া, হোটেলে খানসামাগিরি করিয়া যাহা উপার্জন করিত, তাহার সাহায্যে ইহারা নিজেদের খরচ চালাইত ও সন্ধ্যার পর নৈশবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিত।"

"তাহারা যে কেবল নিজেরা শিক্ষালাভ করিয়া ক্ষান্ত রহিল তাহা নহে। একটি বিরাট সঙ্ঘও স্থাপন করিল। উহার নাম Movement for education of illiterates in China অর্থাৎ চীনের নিরক্ষরদের শিক্ষাদান করিবার আন্দোলন।

"স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, অবকাশের সময়ে তাহারা নিরক্ষর গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশে সহস্র সহস্র ছাত্র সমস্ত চীনদেশে ছড়াইয়া পড়িল, ছাত্রদিগের অনেকেই অতি দরিদ্র, অনেকেই দিনের বেলায় ছোট-খাট জিনিষ ফিরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিত তাহার সাহায্যেই নিজেদের খরচ চালাইয়া লইত এবং রাত্রিতে পল্লীতে পল্লীতে নৈশবিদ্যালয়ে অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিত। মাঝে মাঝে গ্রামের সমস্ত বয়স্ক লোকদের একত্র করিয়া তাহারা সাধারণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিত।

কিন্তু ইহাতেই চীনা ছাত্রগণের কাজ শেষ হইল না। তাহারা "অতঃপর গ্রাম্যভাষায় লিখিত সহজপাঠ্য পুস্তক রচনায় মন দিল। চীনের লেখ্যভাষা এত কঠিন ও দুর্বোধ্য যে, তাহা শুধু সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেই আবদ্ধ, জনসাধারণের সঙ্গে সে ভাষার কোন যোগাযোগ নাই। অবিলম্বে শত শত শিক্ষিত যুবক চীনদেশের অমূল্য সম্পদ পুরাতন নীতিগ্রন্থগুলিকে সাধারণ বোধগম্য সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে লাগিল।

অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুবকগণের এই অভিযান শুধু নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, সাময়িক বক্তৃতা প্রদান ও সরল পুস্তক প্রণয়নেই পর্যবসিত

হয় নাই, দেশের দুর্দশা যাহাতে আপামর জন-সাধারণের উপলব্ধিগত হয়, লোকের মধ্যে উন্নতির তীব্র স্পৃহা জাগ্রত হয়, তাহার চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। অবকাশ সময়ে দলে দলে ছাত্র চীনের পল্লীতে পল্লীতে পতাকাহস্তে দেখা দিয়াছে। এই সকল পতাকার কোনটিতে হয়ত লিখিত আছে, "অশিক্ষিত মানুষ অন্ধ অপেক্ষাও অধম", কোনটিতে হয়ত লেখা রহিয়াছে, "চীন জাগো, জাপান যে অসাধ্য সাধন করিয়াছে তুমি তাহা পারিবে না কেন ?"

যে সকল সমস্যা চীনা ছাত্রদের এরূপ কর্ম-পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, বাঙালী ছাত্রদলকে সেই সকল সমস্যার মীমাংসায়ই আত্মবলি দিতে হইবে। তাই চীনা ছাত্রদের উৎসাহবাণী উচ্চারণ করিয়া আচার্য রায়ের ভাষায় বাংলার তরুণদের আহ্বান করিতেছি—

"হে বঙ্গদেশীয় যুবকগণ—যুবক ও ছাত্রবৃন্দ, তোমরাই আমাদের ভাবী আশাস্থল। একবার বুকে হাত দিয়া আত্মপরীক্ষা করিয়া বল দেখি, তোমরা চীনের যুবকদের তুলনায় তাহাদের সহস্রাংশের এক অংশ শক্তিও দেশের কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করিতেছ কিনা ?"

চীন যাহা পারিয়াছে, তোমরা তাহা পারিবে না কেন ?

আশা ও আকাঙ্ক্ষা

বাঙালী যাহাতে অর্থে-সামর্থ্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সব দিক্ দিয়াই জগতের সমক্ষে সগর্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, ইহাই আচার্যদেবের আকৈশোরের কাম্য ছিল। বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। তাই দেখি প্রফুল্লচন্দ্র যাহা কিছু করিয়াছেন সব কিছুরই মূলে রহিয়াছে জাতীয় কল্যাণ। তিনি রাসায়নিক গবেষণা করিতেন, অর্থ নৈতিক বক্তৃতা দিতেন, সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিতেন, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যাহা কিছু করিতেন—সকলেরই লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক, তাহা জাতীয় কল্যাণ। অনেকে তাঁহার বকুনি শুনিয়া বলিতে পারেন, আচার্য বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঘোর সংশয়ী। কিন্তু তাহা মোটেই নয়। বাঙালীর উপর তাঁহার কত বড় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থ-পরতার প্রভাবে। তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই হঠে গিয়ে পিছনে পড়ে গেছি। সর্বনাশকারী পল্লবগ্রাহিতা আমাদের নষ্ট করেছে। ৺প্রতাপ মজুমদার বলেছেন, 'জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হাঁদা, বাঙালী অতি বুদ্ধিমান্।' আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে স্বল্পায়াসে কৃতকার্যতা লাভ কর্‌তে চেষ্টিত করে! তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা।"

'আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের পথ উন্মুক্ত হ'বে, কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার কর্‌তে হ'লে বাঙালীর জীবনে চাই সাধনা—তিল তিল ক'রে আত্মদান। বাঙালী আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে প'ড়ে থাক্‌লে ভারতের নিদারুণ দুর্দশা ঘুচ্‌বেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙালীর সাধনা ভারতের সিদ্ধি আনয়ন কর্‌বে।'

আচার্যদেবের এই বাণী সফল হোক্, সত্য হোক্, সার্থক হোক্।

প্রয়াণ

আচার্যদেব ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে দেহত্যাগ করেন। এই দিবসেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও কয়েক বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিতাপার্শ্বে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। আচার্যদেব আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন একদল বৈজ্ঞানিক, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আর তাঁহার একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধনার দান ও উৎসাহোদ্দীপক বাণী। মানবের কল্যাণ-সাধনায় তাঁহার কার্য ও দান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বাণী

সমাজে সাম্য চাই

দেশের প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর সমান মনুষ্যত্ব অস্বীকার, আমাদের হীনতার একটি প্রধান কারণ। জন্মতঃ কেহই বড় নয়, কেহ ছোটও নয়। তাহাই সামাজিক সুব্যবস্থা, যাহা জন্মনির্বিশেষে প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে তাহাদের শক্তি ও চেষ্টা অনুসারে যে কোন দিকে ভাল ও বড় হইবার, সমাজসেবক হইবার সমান সুযোগ দেয়। এ পর্যন্ত কোন দেশের সমাজ-ব্যবস্থাই এরূপ নিখুঁত হয় নাই ; কিন্তু পাশ্চাত্য কোন কোন দেশের সমাজ-নীতি এই আদর্শের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় এই সাম্য-নীতি যে ভাবে অস্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, এখন তাহা আর কোন দেশে সে ভাবে কার্যতঃ অস্বীকৃত হইতেছে না। এজন্য আমরা হীন হইয়া আছি, অন্য কোন জাতি শক্তিশালী ও অগ্রসর হইতেছে। অনেকে সামাজিক সাম্যের মানে না বুঝিয়া বা উহার কদর্থ করিয়া সাম্য নীতিকে উপহাস করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। সামাজিক সাম্যের মানে ইহা নয় যে, প্রত্যেক মানুষেরই বুদ্ধিবৃত্তি বা অন্যবিধ শক্তি সমান, এবং সব মানুষ সব বিষয়ে সমান। ইহার মানে এই যে, জন্মনির্বিশেষে সকল মানুষের কোন-না-কোন দিকে ভাল, শক্তিশালী ও গুণশালী হইবার সমান সম্ভাবনা থাকার, সকলেরই ব্যক্তিত্ব ও গুণ বিকাশের শক্তি অর্জনের সমান সুযোগ পাওয়া উচিত। জাত বিশেষে, পরিবার বিশেষে কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লইবার কোন কারণ নাই যে, সে বুদ্ধিতে,

জ্ঞানে, শক্তিতে, চরিত্রে, বীরত্বে বা অন্য কোন বিষয়ে হীন হইবেই।

পক্ষান্তরে ইহাও ধরিয়া লওয়া উচিত নহে যে, কেহ কোন জাতে, বংশে বা পরিবারে জন্মিয়াছে বলিয়াই তাহার একটা গুণশালী মানুষ হইবার সম্ভাবনা বেশী। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ সুপ্রসিদ্ধ লোক তাহাদের বংশকে ধন্য করিয়াছেন, কিন্তু বিখ্যাত বংশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ধন্য ও কীর্তিমান্ হন নাই।

*   *   *   *   *

আমি অন্যত্র এই একই কথা ব'লেছি যে মানসিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা এক সঙ্গে হওয়া চাই। এর মধ্যে একটি চেপে অন্যগুলির কথা প্রচার কর্‌বার প্রয়াস বিফল হবে, তাতে জাতির কল্যাণ হবে না। কারণ জাতীয় উন্নতি অর্থে একটা বাঁধাধরা কিছু বুঝায় না,—বুঝায় সকল দিকে সর্বপ্রকারে জাতীয় জীবনের অশেষ বিকাশ ও প্রসার।

*   *   *   *   *

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধনী কি দীনদরিদ্র প্লিবিয়ানের মেয়ে বিয়ে করেন, না তার সঙ্গে এক সঙ্গে আহারাদি কর্‌তে সম্মত হন? তা যখন চলে না তখন আর আমাদের সঙ্গে তফাৎ রইল কোথায়? Things which are equal to the same things are equal to one another. যুক্তি এমনই চমৎকার! বংশগত জাত আর অবস্থাগত জাত যে এক নয় তা এইটুকু বল্‌লেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, বিশেষ বংশে জন্মগ্রহণের উপর কারো হাত নাই, কিন্তু অবস্থার

পরিবর্তন মানুষ চেষ্টার দ্বারা কর্‌তে পারে। দরিদ্র ধনী ও গুণী হয়ে উঠলেই য়ুরোপ-আমেরিকায় তারা কুলীন হ'য়ে পড়ে। দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী হ'য়ে সার্ বা লর্ড উপাধি অনেকেই পেয়েছেন এবং তাঁরা সমাজে অভিজাতদের সমকক্ষ হ'তে পেরেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের নীচু জাত হাজার তপস্যা কর্‌লেও এখন আর পূর্বকালের মত উচ্চ জাত ব'লে গণ্য হ'তে পারে কি ?

সুতরাং বর্তমান য়ুরোপ বা আমেরিকায় জাতিভেদ আছে, অতএব আমাদের দেশেও জাতিভেদ কোন ক্ষতির কারণ হ'তে পারে না—এই বলে চীৎকার ক'রে যাঁরা পুরাতনের কঙ্কাল এখনও আঁক্‌ড়ে ধ'রে রাখ্‌তে চান, তাঁরা একবার যুক্তি সহকারে বিবেচনা ক'রে বুঝে দেখ্‌বেন যে পাশ্চাত্য দেশে অভিজাতের সম্মান এ দেশের মত একটা নিছক পাগলামি নয়। তাঁতি, জোলা, গাড়োয়ানের ঘর থেকে এ দেশে ক'জন বড় লোক হবার সুযোগ পেয়েছে ? এ দেশে যদি তেলির ঘরে জন্ম হ'ল ত মানুষ চিরকাল তেলিই র'য়ে গেল,—সে যত গুণের গুণী হোক্ না কেন সমাজে খানিকটা হেট হয়ে থাক্‌তেই হবে, গুণ থাক্‌লেও সমুচিত আদর সে কখন পাবে না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আজ লর্ড হ'য়েছেন বিলাতী আভিজাত্যের নিয়মে, কিন্তু আমাদের দেশে যিনি কুলীন বামুন হ'য়ে না জন্মেছেন তিনি আর তা হ'তে পার্‌বেন না। লর্ড রবার্টস্ জীবনের প্রারম্ভে ছিলেন সামান্য সৈনিক ; কিন্তু সামরিক বিভাগে অসাধারণ গুণপনার পরিচয় দিয়ে শেষে সমাজে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য লাভ ক'রেছিলেন। লর্ড কিচ্‌নারও তাই। এরূপ আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে যাঁরা বিদ্যাবিজ্ঞানে, ব্যবসা-

বাণিজ্যে, কৃষিশিল্পে, সর্বপ্রকার কর্মক্ষেত্রে গুণের পরিচয় দিয়ে, অসাধারণত্ব দেখিয়ে সামান্য থেকে বড় হ'য়ে উঠেছেন এবং পাশ্চাত্য সমাজ তাঁদের বড় ব'লে, শ্রেষ্ঠ ব'লে, গুণান্বিত ব'লে আদর ক'রে বরণ ক'রে নিয়েছে। ইংলণ্ডে চাষার ছেলে, মুদীর ছেলে অক্‌স্‌ফোর্ডে বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন ক'রে অভিজাত শ্রেণীর সকল প্রকার রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপ লেখাপড়া শিখে গুণী হ'য়ে সে পূরাদস্তুর Gentleman হয়। আমেরিকায় প্রজাশক্তির চূড়ান্ত উন্মেষ হ'য়েছে; তাই সেখানে দেখা যায়, সামান্য কুটীরে জন্মগ্রহণ ক'রে সমাজের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে উঠেছিলেন রাষ্ট্রনায়ক মহামতি গারফিল্ড। সে দেশে আজ যে মুটে-মজুর খানসামার কাজ কর্‌ছে, কাল সে বিদ্যার্জনের জন্যে স্কুল কলেজে যাচ্ছে। কেউ বা যে কলেজে চিম্‌নী পরিষ্কারের কাজ করে সেই কলেজেই আবার পড়্‌ছে; তার সহপাঠী ক্রোড়পতির সন্তান যদি তাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে তবে সেই ধনী সন্তানকে নানাপ্রকার লজ্জা ও লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তে হয়। সেখানে আজ যে কাঠ কাটে আর একদিন সে দেশের রাষ্ট্রনায়ক (President) হবার আশা রাখতে পারে। সুতরাং এমন বড় কুলীন সেখানে কে আছে যে তাকে কন্যা দান কর্‌বে না? আমি এখানে পাশ্চাত্য সমাজ-নীতির বিধান কর্‌ছি না, আমার প্রতিপাদ্য এই যে পাশ্চাত্য দেশের জাতিভেদ ও ভারতবর্ষের জাতিভেদের মধ্যে তফাৎ অনেক। আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করে নি; আপন ভাইকে পর ক'রে দেখেছে,

যাহারা পেছনে আছে, তাদের টানিয়া লও

শিক্ষিত যুবক, নমঃশূদ্রকে দেশবাসী ভাই বলে তার সঙ্গে এক সাথে খেতে পার ? তোমাদের বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে হতভম্ব লেগে যায় ; এত বিচিত্র কুলশীলের তালিকাও তোমাদের আছে! তোমার বিয়ের যৌতুকের চাপে কত স্নেহলতা আত্মহত্যা করছে তাহার সংবাদ রাখ ? না ঠিক ঐ সময়ে তোমার পিতৃভক্তির উৎস উথলে উঠে—"কি ক'রব! আমার ত পণ গ্রহণে অনিচ্ছা, কিন্তু বাবা বলছেন! ও বাবা! তিনি যে বুকে ধ'রে মানুষ ক'রেছেন, সেই বুকে কি ক'রে শেল বিদ্ধ ক'রবো ?" হায়রে "বাবার" দোহাই! হে উপাধিধারী যুবক, তুমি ঘোড়া, গরু ও ছাগলের মত নিজকে সর্বোচ্চ দরে বিক্রীত হতে দাও—ধিক্ তোমার শিক্ষা, ধিক্ তোমার দীক্ষা! তুমি আবার স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য আগুয়ান! তুমি মানসিক দাসত্বের নিগড় আপন চরণে এমন ক'রে পরিয়েছ যে, এক পা-ও অগ্রসর হ'তে পার না। তুমি দেশাচার-জুজুর ভয়ে এত ব্যতিব্যস্ত যে কোন প্রকার সমাজ-সংস্কারে হাত দিতেও ভীত হও। তুমি বারেন্দ্র হ'য়ে 'কাপের', বঙ্গজ হ'য়ে দক্ষিণ রাঢ়ীর কন্যার পাণি গ্রহণ করতে বললে ভয়ে আড়ষ্ট হও।

* * * *

জাপান আজ ৫০ বৎসরের মধ্যে কি প্রবল শক্তি-সম্পন্ন হ'য়েছে! সে ইংরাজ-আমেরিকাকে চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলে। কিন্তু আমাদের

স্থান কোথায় ? আমরা যে এখনও নীচে পড়িয়া আছি তাহার একটা কারণ আত্মপ্রবঞ্চনা ও ব্যবসাদারী। আমাদের দ্বিধা-বিভক্ত জীবনের বাইরের দৃশ্য যেমন সুন্দর, ভিতরের দৃশ্য তেমনি কুৎসিৎ। বাইরে—দেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার, বিধবা-বিবাহ, জাতিভেদ রহিত, ছুঁৎমার্গ পরিহার, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রভৃতির আদর্শ লইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে আকাশ বাতাস কম্পিত করি—আর ভিতরে, উত্তর-রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ২৬ পর্যা, গঙ্গাস্নানের পুণ্যফল, একাদশীতে বিধবার নিরম্বু উপবাস ইত্যাদি অযৌক্তিক কপটাচারের প্রশ্রয় দিই।

* * * *

বাঙালী জাতি ভারতবর্ষের আদর্শস্থানীয় বলিয়া আমরা গর্ব করিয়া থাকি এবং মহামতি গোখ্‌লের সার্টিফিকেট্ ("What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow") বাহির করিয়া আমাদের কথার সমর্থন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কথা এক সময় খাটিত, আজকাল খাটে না। সমাজ-সংস্কারের বিষয়ে একদিন বাঙালী অগ্রণী ছিল—আজ অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছাইয়া পড়িতেছে। কংগ্রেসের একজন নেতা, পরলোকগত পরমেশ্বর পিলে—"Representative Indians" নামে একখানি বই লিখেছেন। তাহাতে তিনি রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, সমাজ-সংস্কারকের জন্ম বাংলা দেশেই হইয়াছে, কিন্তু বাঙালী জীবনের দৈনন্দিন ইতিহাস ও কার্যপদ্ধতি আলোচনা

করিলে মনে হয় সমাজ-সংস্কার বাংলা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

* * * *

যুবকেরাই জাতির আশা-ভরসার স্থল—দেশসেবার পুরোহিত। তাহারাই এগিয়ে যাবে—কিন্তু তাহারাই অনেক সময় পিছাইয়া যায়। কথা হইতেছে কে আগে যাবে। সকলেই বলেন, আমি আগে যাব কেন? যাইতে হয় ত এক সঙ্গেই যাইব। কাজ করিতে হয়তো এক সঙ্গেই করিব। 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাই লাজ'।

* * * *

১৯০৬ সালে "স্বদেশী" আন্দোলনের সময় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালী যুবক নিজের স্বার্থের জন্য নয়, আমার জন্য নয়, দেশোদ্ধার হইবে এই ধারণার উপর কার্য করিয়া অম্লানবদনে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে শিখিয়াছে—কিন্তু সমাজ-সংস্কার কার্যে বিধবা-বিবাহ করিবার লোক পাওয়া যায় না ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি—হুজুগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও ভীত হয় না। কিন্তু আজীবন সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে অসীম আত্মত্যাগের প্রয়োজন, অবিচলিত সাহসের আবশ্যক। প্রকৃত বীর কে? যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের সম্মুখে যে বুক ফুলাইয়া এগিয়ে যায় সে বীরপুরুষ বটে, কিন্তু যাঁহারা সমাজকে টানিয়া তুলিতে গিয়া, সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া, বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য করিতে গিয়া, আজীবন সমাজের অত্যাচার-অবিচার সহ্য করেন, তাঁহাদের বীরত্ব অতুলনীয়, যদিও সাধারণের চক্ষে এই বীরত্বের সম্মান অনুভূত হয় না।

ব্যবসা ধর

এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের যুবকগণ বসিয়া থাকিলে অথবা নির্জীবভাবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ ফেল গণনা করিলে চলিবে না। দেশে ছোট-বড় অনেক চাকুরে লোক আছে, তাহাদের বংশবৃদ্ধি করা কখনও যুবকদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। এ আশা, এ মায়া ত্যাগ করিতেই হইবে। একটি সবল, জীবন্ত যুবক সমাজের দরকার হইয়াছে যাহারা গণ্ডীছাড়া স্বাধীন শিক্ষালাভের জন্য দেশকে নূতন করিয়া গড়িবে, নূতন মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে।

* * * *

ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তো নেই-ই, বাঙলা আজ সকল ক্ষেত্র হ'তেই বিতাড়িত হ'য়েছে। এর কারণ কি? ইংরাজ-শাসনের পূর্বে বাহিরের জগতের সংস্পর্শ-শূন্য হ'য়ে, নিজের আবেষ্টনের মধ্যে আপনার শত অপূর্ণতাতেও আপনি বিভোর ছিল, তখন বাঙলার দিন চলিয়াছিল বেশ। জীবন-সংগ্রামের কঠিন প্রতিযোগিতায় বাইরের ঘাত ও প্রতিঘাত আমাদের জীর্ণ সমাজদেহকে আলোড়িত করিয়া তুলে নাই, তাই অপর্যাপ্ত ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, গরুর দুধে দিন চলিত একরকম বেশ। কিন্তু আজ অন্নাভাব। জীবনধারণোপযোগী এক পোয়া মাছ, আধ সের দুধ আজ মহার্ঘ্য। শুধু কলিকাতায় নয়, পল্লীগ্রামেও কখন কখন দুধের সের আট আনা। আর মাছ ব'লে আমরা যা খাই তা তো কেবল মনকে প্রবোধ দেবার জন্য। আজ বাঙলা দেশে খাদ্যাভাব, পুষ্টিকর খাদ্য নেই; আজ আমরা যেন ঘাস-পাতা খেয়ে কোন প্রকারে জীবন

ধারণ ক'রে আছি। তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের খাপ খাচ্ছে না। তাই আমরা আমাদের দুর্গতির সমস্ত দোষ ইংরাজের ঘারে চাপাইয়া বসি, "ইংরাজ এই সুজলা সুফলা বাঙলা দেশের ধন-ধান্য লুঠে নিচ্ছে।" বাঙলার ধন, বাঙলার ধান্য ইংরাজ অতি কমই লুঠ করে। আজ Behar for the Beharies, Assam for the Assamese, Orissa for the Orias কিন্তু Bengal for everybody ; বাঙালী অতি পারমার্থিক জাতি। বাঙলার দরজা সব সময় খোলা। প্রথমে চৌরঙ্গি, তারপর Exchangeএ যান, দেখ্‌বেন, আমরা পুরাকালের দধীচি মুনির মত কেমন নিঃস্বার্থভাবে নিজের অস্থি পরের উপকারের জন্য অকাতরে দান করছি। রেলি, টার্ণার মরিসন্, গিলাণ্ডর্স প্রভৃতি বণিকদের উপকারার্থে আমরা অম্লানবদনে কেরাণীগিরি করিতেছি। তারপর ভাটিয়া, মাড়োয়ারীরা সমস্ত করতলস্থ ক'রেছে, হ্যারিসন রোড থেকে বাঙালীটোলা প্রায় মাড়োয়ারীর হস্তগত হ'য়েছে। আমরা স্থানচ্যুত হয়ে ৪।৫ তলা বাড়ীর পায়রার খোপের মত সব অংশে এসে আশ্রয় নিচ্ছি। এখন একটু Tightness of the market ব'লে যা কিছু রেহাই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অচিরেই যে আমাদের বিতাড়িত হ'তে হবে তাতে সন্দেহ নাই। শ্রমজীবীদের মধ্যে খুঁজলেও বাঙালী শ্রমিকের অবস্থা ভদ্রলোকদেরই মত। প্রায় ৫০ বছর হ'ল দেখে আস্‌ছি Plumber সব উড়িয়া। জল, ড্রেন, গ্যাসের কাজ এরাই করছে। রাধুনে বামুন হয় উড়ে নয় খোট্টা ; পাড়াগাঁয়ে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে পর্যন্ত উড়ে বামুন, খোট্টা বেহারা। বাঙলা দেশের ধন ধান্য কি এতই অপর্যাপ্ত যে এখানে

কাহারও গৃহে অন্নাভাব নাই, প্রত্যেকের বাড়ীতেই মাটিতে লোহার সিন্দুক পোতা যে এখানে কাহারো মুটে মজুর বেহারা প্রভৃতি হবার দরকার নেই ? আমরা নবাবী ক'রেই চলেছি, যে, দুর্দশা এতে হচ্ছে তা বুঝতে কাহারও কষ্ট হয় না। বিশদ্ ক'রে বলে আর কি হবে।

* * * *

বিফলতা আমাদের অকেজো করে, কিন্তু জীবনে যারা জয়ী হ'য়েছে—বিফলতার উপর ভিত্তি ক'রেই তাদের সৌভাগ্যের প্রাসাদ রচিত।

* * * *

ধরাবাঁধা রাস্তায় চল্‌লে বিদ্যাবুদ্ধি বাঁধাসাঁড়া হ'য়ে পড়ে। কার্ণেগির লোহার কারবার কিনে নেবার জন্য সিণ্ডিকেট তৈরী হ'য়েছিল। সেই সিণ্ডিকেট তৈরী করেছিলেন Morgan. তিনি এক অসাধারণ পুরুষ। যুদ্ধের সময় যখন আমেরিকায় টাকা তোলার দরকার হ'ল তখন এই ব্যক্তির খোঁজ পড়্‌ল। এই মর্গান (Morgan) বলেন ২॥ শত ডলার দিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের নিকট হ'তে ২॥ লাখ ডলারের কাজ আদায় করা যায়। আমাদের দেশেরও সুন্দরমল প্রমুখ ব্যবসায়িগণ আড়াই শ তিনশ টাকার মাহিয়ানা দিয়ে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ রাখেন তাদের দ্বারা কত টাকা রোজগার করেন তার ঠিকানা নাই। বিশেষজ্ঞ 'কলুর চোখঢাকা বলদের' মতই চলিতে জানে। কিন্তু ব্যবসায়ী কলু এদের দ্বারাই তৈল প্রস্তুত করেন। আমাদের দেশের স্যর রাজেন্দ্র মুখার্জি যদি আজ B. E. হ'তেন, তা'হলে দেশের কত বড় যে লোকসান হ'ত তা কি ক'রে বল্‌ব। তিনি হয়ত সরকারী উন্নতিমার্গে এতদিনে বড় জোর ডিষ্ট্রিক্ট

ইঞ্জিনিয়ারত্বে এসে পৌঁছিতেন ; এবং চেয়ারম্যান ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে প্রমোশনের জন্য হাঁটাহাঁটি ক'রে অন্তর্নিহিত শক্তি নিঃশেষ কর্‌তেন। কিন্তু ভাগ্যগতিকে তাঁহাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার প্রয়োজন হওয়াতে আজ তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ একজন পুরুষ। J. C. Banerjiর career আমি অনেকবার ব'লেছি। বাঙালীদের মধ্যে Railway administrationএ যিনি বিশেষজ্ঞ সেই সাতকড়ি ঘোষও কেবল নিজের পায়ে চ'লেই আজ পুরোভাগে এসেছেন। Associated Pressএর কেশবচন্দ্র রায় মহাশয়ের জীবন আরো শিক্ষাপ্রদ। ইনি হিন্দু হোষ্টেলের বাজার সরকার ও লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। এঁর ক্ষমতা ছিল অসীম। মধ্য রাত্রে বড়লাটকে টেলিফোন করিয়া ইনি পরামর্শ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন।

* * * *

তাই বলিতেছিলাম, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাধনা করিবে, সিদ্ধি নিশ্চিত। দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়। Policy of driftingই সর্বনাশ ক'রবে। ল' পড়েছি—প'ড়ে রাখিনা, ওকালতি তো কর্‌বনা—বাপের কাছে কিম্বা শ্বশুরের কাছে তিন বছর আরও খরচ পাওয়া যায়। এই রকম উদ্দেশ্যবিহীন জীবন যাপন ক'রো না।

* * * *

আজ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বাঙলার আশা পূর্ণ হউক—নব প্রেরণার উৎস শতধা হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে কানায় কানায় পূর্ণ করুক। আমরা অসুরের অন্তর্নিহিত অজস্র শক্তির খনির যেন সন্ধান পাইয়া স্বাবলম্বী হই—প্রকৃত শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়া যেন আবার নিজেদের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হই।

চাই সাধনা

সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই, এই কথাই আজ আমি বাঙালী যুবককে বড় আশা ক'রে বল্‌তে এসেছি। আজ এই জীবন-সন্ধ্যায় জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেছি ওই একটা পরম সত্য —সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই।

আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যটি গ্রহণ ক'রতে হবে—মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নয়, একেবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ ক'রে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। মহামতি গোখ্‌লে বলেছেন—What Bengal thinks to-day, the whole of India thinks to morrow—বাঙালীর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা সারা ভারত গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মস্তিষ্ক চালনার ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী বলে গণ্য হ'য়ে এসেছে—বাঙলার কোলে অনেক ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, সুলেখক, বৈজ্ঞানিক, দেশবিশ্রুত বাগ্মী জন্মগ্রহণ ক'রেছেন—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র নাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি এক এক ক্ষেত্রে এক একজন দিক্‌পাল বাঙলার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালী আগুয়ান হ'য়ে চ'লেছে স্বীকার করি—তবু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর আত্ম-পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে, তার চরিত্রের গলদ্ কোথায় ও অন্তরের কোন্ বাধাটা তার চলার পথে পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে।

* * * *

সক্রেটিস্ বলেছেন, যারা আঠার বৎসর পার হ'য়েছে, তাদের উপদেশ দিয়ে কোন ফল নেই। তাই আমার বক্তব্য দেশের যুবক-

বৃন্দের কাছে—যাঁরা আমাদের ভবিষ্যতের আশা, আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে আর এক কথা এই যে "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", এটা আমার কাছে নিতান্তই বাজে কথা ;—আমি বলি "ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"। অপ্রিয় সত্য বল্‌তে হবে—দেশবাসীকে প্রীতি-নিবেদন ক'রে খুব স্পষ্টভাবেই তাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে হবে। পত্রাবরণে ভগ্নস্থান লুকিয়ে রাখ্‌লে দুর্গ-প্রাচীরও সহজেই ভূমিসাৎ হ'য়ে যায়। ঢাক্‌লে অভাব ঘোচে না ; অভাবকে সকল সময়েই মোচন কর্‌তে হয়—আর তার জন্যে চাই কঠোর আত্ম-পরীক্ষা, আর তীব্র বেগবতী ইচ্ছাশক্তি।

* * * *

আর মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট্ সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট্ সম্বন্ধে সেই কথাই সর্বতোভাবে প্রযুজ্য। বাঙলা দেশেও ঐ একই দশা—কেরাণী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকীল। আর সেই গলাধঃকরণ, উদ্‌গীরণ, পরীক্ষা পাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, তারপর মা সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম্-আলেকম্। মুন্সেফ, ডেপুটী, জজ,—তা মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হ'টে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাঁধা ওই চাকরীর ঘানিতে, আর সবার অন্তরের কথা হ'চ্ছে—"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোকঢাকা বলদের মত।"

* * * *

আর একটা কথা। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, চেষ্টামাত্রেই অথবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই সকল কঠিন সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যাবে, তা কখনই নয়। সুতরাং কাজ আরম্ভ ক'রেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করলে চল্‌বে না! মনে রাখতে হবে, প্রয়াসসাধ্য

সকল কার্যেই করার আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয় ; মৃগয়ায় যেমন অন্বেষণই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গূঢ় রহস্য যাঁরা উদ্‌ঘাটন করেন তাঁদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ। আজ আমাদের তাই প্রচেষ্টার আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জার্মাণ দার্শনিক লেসিং সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে, যদি ঈশ্বর এসে তাঁকে বল্‌তেন—তুমি সত্য চাও না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন—আমি সত্যের সন্ধান চাই। কিসে পাব, কেমন ক'রে পাব, এই সে দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে ; এই খোঁজে-খেলায় বিপুল আনন্দে আমি ভরপূর হ'য়ে থাক্‌তে চাই। এই ত প্রাণবন্তের লক্ষণ ; বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অন্বেষণে। আর এই অন্বেষণ বা সাধনা একই কথা।

* * * *

ধর্ম-জগতে বুদ্ধ, যীশু, মোহম্মদ, চৈতন্য এঁদের সিদ্ধিলাভের ইতিবৃত্ত একই। জন-কোলাহলের বাহিরে পর্বতে, জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধনা ক'রে এঁরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অরণ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ গ্রথিত হয়েছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য "সিদ্ধার্থ" ; আমরা অতীতের গর্ব ক'রে থাকি, কিন্তু অতীতের প্রাণের লক্ষণগুলিকে আপন জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই না ;—অতীতের সিদ্ধির উপর আমাদের লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্তু তার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার কথা শুনে আমরা আতঙ্কে ম'রে যাই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা আজ শতদলের মত বিকশিত হ'য়েছে। কিন্তু একটির পর একটি ক'রে এই শতদল ফুটেছে,—এর পিছনে

আছে একনিষ্ঠ সাধনা। গোখ্‌লে স্কুল-মাষ্টার ছিলেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ছিলেন। পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫৲ টাকা মাহিনায় গোখ্‌লে ফারগুসন্ কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু গোখ্‌লে আজ দেশপূজ্য, তার কারণ তিনি দেশসেবার সাধনা করেছিলেন। এই দারিদ্র্য-ব্রতধারীর বজেট-বক্তৃতায় ব্যবস্থাপক সভায় লাট কর্জন কাঁপ্‌তেন। আর এক প্রাতঃস্মরণীয়ের কথা ব'লে আমার কথা শেষ করি ;—তিনিও দারিদ্র্য-ব্রতধারী, মহাসাধক মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী আজ বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু এক দিনেই কি তাঁর নাম বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে ? ২১ বৎসর পূর্বে আলবার্ট হলে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্দশা দেশবাসীর নিকট বিবৃত করিতে আমিই প্রথম তাঁকে আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—কেপ্ কলোনিতে (Cape Colony) ভারতবাসীর অশেষ দুর্দশার কথা। মহাত্মা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী-দের নেতা। তিনি দেশবাসীর হিতের জন্য আপনাকে একবারে নিঃশেষ ক'রে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন।

নেটাল প্রদেশে তিনি তাদের সঙ্গে তুল্যভাবে নিগৃহীত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হয়েছিলেন। মাসে ৫।৬ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে সবার ব্যথাকে বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কত বার জেলে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, মেথরের কাজ পর্যন্ত করেছেন। তাই ত তিনি আজ জনসাধারণের হৃদয়-মন অধিকার কর্‌তে পেরেছেন। আজ অন্ততঃ ২৭।২৮ বৎসর যাবৎ তিনি নিগৃহীত ভারতবাসীর নেতা—

যেখানে অত্যাচার, উৎপীড়ন, সেইখানেই মহাত্মা গান্ধী ; তাই আজ তাঁর নামে দলিত জনসঙ্ঘের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠে—আশায় উৎফুল্ল হয়। এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের পশ্চাতে র'য়েছে মহাত্মাজীর আজীবন সাধনা।

* * *

রামমোহন রায়কে বাঙলার ঘরে পাঠানো বিধাতার একটি বিশেষ বিধান ব'লে আমার মনে হয়। আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনার পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পথ অধিকার করতে হ'লে বাঙালীর জীবনে আজ চাই সাধনা—তিল তিল ক'রে আত্মদান। বাঙালী আজ স্থির-প্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'য়ে ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে প'ড়ে থাক্‌লে ভারতের নিদারুণ দুর্দশা ঘুচবেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙালীর সাধনা ভারতের সিদ্ধি আনয়ন করে।

* * * *

১৯০৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় যারা ভেসে-ছিলেন, তা'দের অনেকেই আবার ভাসার মুখে উল্টাপথে ভেসে যাচ্ছেন। যা'রা স্রোতের মুখে তৃণের মত, নূতনের প্রতিষ্ঠা কর্‌বার জন্য যা'দের উৎকট পুরুষকার, সেই তাঁদের উদ্দীপনার অগ্নিশিখা শেষে গোলদীঘির ধারে বক্তৃতা ও হাঁকডাকের ধূমরাজিতে পরিণত হ'ল। ব্যবসা নীতি ও অর্থশাস্ত্রের কখনও জ্ঞান নাই, তাই শুধু বক্তৃতার দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও অর্থ-সংস্থানের পূর্ণ চেষ্টা আমাদের ভিতরে-বাহিরে খুব একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে গেল। স্বদেশী

আন্দোলনে বাঙলার শিল্প জাগ্‌ল না—কিন্তু জাগ্‌ল বোম্বাই শিল্প। বোম্বাই প্রদেশে কাপড়ের কল-কারখানা স্বদেশীয় হাওয়ায় বেশ শ্রীসম্পন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল।

বাঙলার স্বদেশী শিল্পের যে পুনরুত্থান হয় না তার প্রবল কারণ বাঙালী উদ্যমহীন, অলস ও আরাম-প্রিয়। আবেগপূর্ণ ভাবপ্রবণতা দ্বারা আমরা হনুমানের মত এক লাফে সাগর পার হ'তে চাই। কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাসের পশ্চাতে বিপুল কর্মচেষ্টা না থাকায় আমাদের কেবল ভরাডুবি হ'তে হয়। আবার ভিতরের এই সাংঘাতিক বাধা—সকলকে আমরা কথার চটকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি। নীরব সাধনা ভিন্ন যে কোন কাজ সম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব—এই খাঁটি কথাটি সত্যভাবে স্বীকার ক'রতে আমরা কুণ্ঠিত হই; কিন্তু অকুণ্ঠিত-চিত্তে কেবল গলাবাজীর দাপটে আমরা দু'বেলা দেশোদ্ধার ক'রে থাকি।

আমি নিজকে "স্বদেশী" ব'লে পরিচয় দিলে বোধ হয় কেউ ক্ষুণ্ণ হবেন না। অভিজ্ঞতার ফলে এই সহজ সত্যটি আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, ধর্ম বা বিজ্ঞান বা ব্যবসা-বাণিজ্য যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে হ'লে কঠোর তপস্যা চাই। নীরব সাধনা ভিন্ন একদিনে এক লাফে কোন কাজই হবে না।

হিন্দু ও মুসলমানে মৈত্রী

বাংলার মুসলমান আমাদের রক্তমাংস। তাঁহারা হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতার নিমিত্ত ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। তারপর আমরা যাহারা হিন্দু আছি আমাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত। আজ যে বাঙলায় শতকরা ৫২ জন মুসলমান তাহারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এই সকল অস্পৃশ্য জাতি আমাদেরই অত্যাচারে—রাজশক্তি প্রয়োগে নয়—ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি রাজশক্তি প্রয়োগে হিন্দুরা মুসলমান হইত, তাহা হইলে দিল্লী ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির নিকটবর্তী স্থানে মুসলমান-সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইত। তাহা না হইয়া দেখা যায় যতই রাজতক্ত হইতে বেশী দূরে ততই মুসলমানের সংখ্যা অধিকতর। বল্লালী নিয়মের কঠোরতাই ইহার একমাত্র কারণ। ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র একতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব। যখন মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া এই মূলমন্ত্র প্রচার করিলেন, তখন সকলে দলে দলে গ্রামের পর গ্রাম আসিয়া মুসলমান হইতে লাগিল। তাহাদের আমীর ফকীর একসঙ্গে উপাসনা করেন। বাদশাহ যেখানে উপাসনার জন্য বসিবেন, একজন গরীব ভিস্তিওয়ালাও সেইখানে উপসনার জন্য বসিবেন। দেখুন দেখি তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব কতখানি? কত বড় সমতা! ইসলাম-ধর্ম বলিয়া পরিচয় দিলে সব এক। একপাত্র হইতে খাইতে হইবে। আরব দেশে মুসলমান অতিথিকে ভিন্ন পাত্রে খাইতে দিলে তাহার অবমাননা করা হয়। আমাদের বার রাজপুত ত তের হাঁড়ি। কপটতা সহ্য হয় না। আমরা যে কত পাপ করিতেছি তাহা বলিবার নয়।

বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের ধমনীতে একই রক্ত—মোগল আফগান তাতার বংশোদ্ভব মুসলমান বাংলায় ক'জন? মৌলানা আক্রামখাঁর এবং ঠাকুর পরিবারের এক পূর্বপুরুষ—উভয়ে এক বংশজাত—ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনের গল্পটা সকলেই জানেন বোধ হয়—রবিবাবু বলেন যে ঘ্রাণের চেয়ে একটু বেশী এগিয়েছেন বোধ হয়। ঠাকুর পরিবারের কথা বাদ দিন—ধন, বিদ্যা ও অশেষ গুণালঙ্কৃত এঁরা—সমাজে এঁদের মর্যাদা প্রতিপত্তির কথা বিচার না ক'রে—ইহাদের জ্ঞাতি গোত্র পাড়াগাঁয়ে কি ভাবে থাকেন, তা কাহারও অজানা নাই।

'Manchester Guardian'এর প্রতিনিধি পাকা কথা বলেছেন। উত্তর প্রদেশের একজন শিক্ষিত মুসলমান তাঁকে বলেছেন যে, একটা বিরাট জাতি সংগঠন—শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব, যদিও বাংলার মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫২ আর হিন্দু শতকরা ৪৮ জন। কিন্তু বাংলা দেশে হিন্দু মুসলমানের ভাষা এক, রক্ত এক, দেশ এক। ২০০।২৫০ বৎসর পূর্বে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু ছিল। "Scratch a Bengali Mussalman and you will find him a Hindu." কিন্তু বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত যদিও হিন্দুর সংখ্যা বেশী, তবু জাতি সংগঠন তাদের পক্ষে এত সোজা নয়, কারণ তারা মাতৃভাষা ত্যাগ ক'রে উর্দূ, পারসী ভাষা গ্রহণ করেছে। হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া বাংলা দেশে ছিল না, এখন হয়েছে। ভালই হয়েছে, বদ্ রক্ত বেরিয়ে গেলেই মঙ্গল। যত আলোচনা, সমালোচনা হয় ততই সবাই বুঝ্‌বে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। জাপানে দেখা যায় বাবা বৌদ্ধ বা সিংটো, ছেলে খৃষ্টান; এতে তাদের ধর্ম বাঁধে না, কারণ দেশ-প্রেম জাপানের আসল ধর্ম।

শিক্ষা ও ব্যবসা

এখন শিক্ষালাভের জন্য বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার প্রয়োজনীয়তা খুবই কম—বাড়ী বসে বসে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। আমাদের দেশেই অনেকে নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায় গুণে অতি হীন অবস্থা হইতে যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন—উদাহরণ স্বরূপ হরিশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে; এঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিল না। আজকাল হাটে, মাঠে, ঘাটে কত বি. এ. দেখা যায়—কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মপ্রচেষ্টা নাই—নূতনত্ব নাই—মৌলিকত্ব নাই—চিন্তা করিতেও যেন তাহারা নারাজ! বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মচরিত পাঠে জানা যায়, তিনি ছাপাখানায় দিনের বেলা কাজ করতেন, আর রাত্রিকালে জেগে পড়তেন—পুস্তক-বিক্রেতাদের কাছ থেকে বই চেয়ে এনে—রাত জেগে পড়ে সকালেই আবার ফিরিয়ে দিতেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ছিল। তিনি তড়িৎ-শক্তির আবিষ্কর্তা—তাঁহার তড়িৎ সম্বন্ধীয় অভিমতগুলি বৈজ্ঞানিক জগৎ মাথা পেতে নিয়েছে। আমেরিকা স্বাধীনতা সমরের (American War of Independence) সময় তিনি দৌত্য কার্যে ইংলণ্ডে এবং পরে ফরাসী দেশে গিয়েছিলেন।

*   *   *   *   *

এই যে মহামূল্য সময় নষ্ট হচ্ছে—২৪ মাসের ২২ মাস আহার-নিদ্রা, খোস-গল্প ও তাস-পাশায় কাটিয়ে দিচ্ছ—ভাব কি এতে

নিজের জীবনের ও দেশের কত ক্ষতি হচ্ছে? ডিগ্রী লাভ কর্তে দু'মাসই যথেষ্ট; তা ছাড়া শুধু একটা ডিগ্রী ও নক্‌রী নিয়ে একটা জাতি বেঁচে থাক্‌তে পারে না। নক্‌রীর মায়াও ত ঘুচে গিয়েছে। ১৫।২০ বৎসর আগে মুসলমান বি. এ. পাশ কর্‌লে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট হ'তে পার্‌ত, আজ সে পথ বন্ধ। সদরওয়ালা থেকে আর্‌দালী পর্যন্ত গণনা করলে দেখা যায়, শতকরা মাত্র দু'জন সরকারী চাকুরী করেন। কয়জন বা মুন্সেফ, ডেপুটী, সবডেপুটী গিরি পায়? অথচ এর জন্যই কংগ্রেসে গিয়ে প্যাক্ট্‌ করতে হয়। কর্‌তে হয় প্যাক্ট করুন; আমি এখানে রাজনীতিক আলোচনার জন্য আসি নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, স্বরাজ মানে কি এই যে, স্বরাজ হ'লে দেশের লোক ইংরেজ কর্মচারীর ন্যায় গরীবের অর্থ শোষণ ক'রে উচ্চ বেতন পাবে, আর হিন্দু ও মুসলমান ভাইয়েরা ৬৪ হাজারী মিনিষ্টারী বা ৪ হাজারী হাইকোর্টের জজগিরির জন্য বখ্‌রা আরম্ভ কর্‌বে? আমি বুঝি, স্বরাজ হ'লে যারা শিক্ষিত তারা চাষী মুসলমানের ছেলে, বাগ্‌দীর ছেলে, চামারের ছেলে প্রভৃতিকে নিয়ে নৈশ বিদ্যালয় কর্‌বে, পূজার ছুটীতে, গ্রীষ্মের ছুটীতে শিক্ষাদান করে যারা নীচে পড়ে আছে তাদের টেনে তুল্‌বে। কেবল ভাল ছেলে হলে চল্‌বে না।

"ভাল ছেলে" পারিতোষিক পায়, সকলের কথা মত চলে, নাদুস্ নুদুস্ শরীর, যেমন চালাও তেম্নি চল্‌বে। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম "পুত্তলিকার চক্ষু আছে, কিন্তু দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না।" ভাল ছেলেও ঠিক সেই রকম। ব্যক্তিত্ব নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই, এমন কি নিজের জন্যও ভাবতে পারে না।

আমি ভাল ছেলে চাই না, ডান্‌পিটে ছেলে চাই। বাঙালী যে দপ্‌ করে উঠে খপ্‌ করে নিভে যায়—ভাল ছেলে সাজা তার একমাত্র কারণ। অন্যান্য দেশে কিন্তু এ রকম হয় না। বিলাতেই একটি ছেলেকে, লেখাপড়া করে না বলে, বাপ-মা ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিয়েছিল—হয় আত্মনির্ভরশীল হতে, নয়ত ম্যালেরিয়ায় মর্‌তে। সেই ২০।২২ বর্ষীয় যুবকই এই ভারত-সাম্রাজ্য জয় করে ইংলণ্ডকে উপহার দিয়ে গেছে। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, অতগুলি প্রথম শ্রেণীতে পাশ হয়েছে, অতটা বৃত্তি পেয়েছে, যেমন মাছ ধরার জন্য বরশী ফেলে, চার ফেলে, তেম্নি ভাল ছেলে জুটাবার জন্য বৃত্তির লোভ দেখান হয়।

কিন্তু এই সব জলপানীওয়ালা ছেলে পাশ করে যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন এক কড়া দুধ জ্বাল দিলে যেমন গড়্‌ গড়্‌ করে উথ্‌লে উঠে আবার থেমে যায়, সেইরূপ তাদের শক্তি, সামর্থ্য সব নিস্তেজ হয়ে যায়। এমন ভাল ছেলে দিয়ে কি হবে? লেখাপড়ার দরকার, সারাজীবন লেখাপড়া করতে হবে।

* * * *

আসল কথা ব্যবসা-বাণিজ্যও করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ২।১ ঘণ্টা করে রোজ পড়া যায়। পড়্‌লে মন সতেজ থাকে, কাজে উৎসাহ জন্মে, বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হয়, আর ডিগ্রীর মোহও কেটে যায়। আজকাল Graduateএর গড়পর্‌তা মাইনে ২৫৲ ক্রমে ৪০৲ টাকা পর্যন্ত হয়। আমি অনেক জায়গায় বলেছি, "There does not exist on earth a more miserable creature than the average graduate of the Calcutta

University"। অথচ এই উপাধির জন্য অনেকের চুল পেকে যায়, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে। কার্ণেগী অনেক বই লিখেছেন। তাঁর মত ধনী পৃথিবীতে মাত্র ২।৪ জন হয়েছে। তিনি অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যবসায় বলে পিট্স্‌বার্গের লোহার খনির মালিক হইয়াছিলেন। তিনি ৯০ কোটী টাকায় তাঁহার ব্যবসা বিক্রয় করিয়া আজীবন বিদ্যাশিক্ষা ও পরহিত ব্রতে সম্পত্তির অধিকাংশ ব্যয় করেন। মাড়োয়ারীরা লোটা কম্বল সম্বল করে এদেশে এসে লক্ষপতি ক্রোড়পতি হয়েছে এবং হচ্ছে। আর আমরা ফিন্‌ফিনে উড়ানী, সুগন্ধি তেল এবং নানাপ্রকার বিলাসব্যসনে মগ্ন হয়ে পথের ভিখারি হয়ে চলেছি ও ডিগ্রীর গর্ব করে নিজেদের অসারতা ও অপদার্থতার পরিচয় দিতেছি। যে মুস্তাফা কামালপাশার নামে পৃথিবী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, যাঁর প্রবল শক্তি ইউরোপের উপর এসিয়ার জয় ঘোষণা করছে, তিনি ডিগ্রীধারী কিনা জানি না, কিন্তু তিনি দূরদর্শী, অভিজ্ঞ এবং তার উপর সাহসী। ৫।৬ বৎসর আগে মাদ্রাজে ৩।৪ হাজার ছেলের সাম্‌নে বক্তৃতা উপলক্ষে বলেছিলাম, 'I often travel with my books and research scholars'। এখনও আমি তাই করে থাকি।

শিক্ষার আদর্শ

মোট কথা এই, যে ছেলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের বাহিরে যত খবর রাখিবে সেই ছেলেকে তত বাহবা দিব। অর্থাৎ যে শিক্ষার দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফূরণ হয় ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে ও মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমার নিজের জীবন-স্মৃতির কথা বলিতে আমি বড়ই সঙ্কুচিত হই, কিন্তু একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে। আমি যখন হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন একবার দুরন্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসর ভুগি। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। এই দুই বৎসর বাধ্য হইয়া আমাকে বাড়ীতে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ঐ সময়ে লাটিন, ফরাসী ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করি। বঙ্গদর্শনে রামদাস সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে প্রত্নতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ লিখিতেন আমি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সেই অল্প বয়সে আমার মনে ঐ যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল তাহা বহুকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় গুপ্ত থাকিয়া হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস লিখিবার সময় পুনর্বার প্রকাশিত হয়। বাল্যের সেই যে প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহাই উত্তরকালে কিয়ৎ-পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছে।

* * * *

জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চ'লে

গেছে বুঝ্‌তে পারিনি। আজ বার্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু'ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সাথী করে কাটিয়ে দি,—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎ চিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত। উপনিষদ্ ও ষড়দর্শনের তত্ত্ব, গ্রীসদেশের সক্রেটিস্, প্লেটো ও আরিষ্টটল্ প্রভৃতি মহানুভবগণের চিন্তারাশি এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যে মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁদের বাণী,—সকলই পুস্তকের মধ্যে। তাঁরা যা দিয়ে গেছেন তা অমূল্য সামগ্রী। আমরা সকলেই উত্তরাধিকারসূত্রে তার অধিকারী।

* * * *

আমি এখন নিজকে ছাত্র ব'লে গণ্য করি। ঐ জীবন ত্যাগ ক'রে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ ক'রেছি ব'লে মনে হয় না। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"—বাস্তবিক এই ঋষিবাক্য বড় সত্য—বড় সার কথা। আর আমাদের এই ছাত্রজীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের পার্থক্যের প্রাচীর বড়ই অমঙ্গলকর।

* * *

ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি ষ্টাডী অর্থাৎ পাঠাগার থাকে। সেখানে প্রবেশ করিবার অর্থ এই—আর যেন কেউ না দেখে বা ঢোকে। যেমন আমাদের দেশের ঠাকুর-ঘর। ভক্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, হৃদয়-দেবতাকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন—কিন্তু তা লোক-চক্ষুর অন্তরালে—আর কেহ দেখে না। আমাদের পাঠাগারকে ঠাকুর-ঘরের পবিত্রতায় মণ্ডিত করতে হবে,

তাকে নিভৃতে স্থাপন করতে হবে—যেন চপলতার গোলমাল সেখানে না পৌঁছায়।

শিক্ষার সীমা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে—দেহ সবল, সুস্থ, কর্মঠ করা আজকাল শিক্ষার একটি প্রধান কর্তব্য। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার ও জীবন-যাত্রার এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যার্থীরা পাঠ শেষ করিয়া যখন সমাজে প্রবেশ করিবে, তখন নীরোগ ও কাজের উপযোগী হইয়া বাঁচিবার অনুকূল বিজ্ঞান-সম্মত নিয়মগুলি তাহাদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে অভ্যাসে পরিণত হইয়া থাকিবে। তাহাদিগকে আর ম্যাজিক লণ্ঠন অথবা বক্তৃতার সাহায্যে নিয়মিত ব্যায়াম, নির্মল বায়ু, আলোক পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টিকর খাদ্যের মহিমা বুঝাইতে হইবে না। তাহাদের দেখিয়া আর দশজন শিখিবে। আমাদের প্রথমে কর্তব্য এই মুমূর্ষু, দৃষ্টিহীন, শক্তিহীন, শিক্ষিত দলের পরিবর্তে একদল সুস্থ ও শক্তিমান্ শিক্ষিত যুবক-সমাজ তৈয়ারী করা। সমাজে তাহাদের 'ছোঁয়াচ' লাগিবে। ব্যাধি ও দোষ সংক্রামক, শক্তি এবং সদ্‌গুণও সংক্রামক। আজ কবির কথায়—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট"

আর আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Students' Welfare Committee's Reportএ দেখিতেছি—Out of every three students two have some defect or other. লণ্ডনের শিক্ষা ছেলেদের বলবান্ করিল, সুস্থ করিল, সুখী করিল;

আর আমাদের প্রতি তিন জনে দুইজন রুগ্ন। স্যাডলার কমিশন বলিয়াছেন, "বাঙালীর ছেলেরা হাসে না, হাসিতে পারে না।"

শিক্ষকগণ, আজ জাতির জীবন-মরণ-সমস্যায়, তাহার অস্তিত্ব-সঙ্কটে, আপনাদের নিকট কর্তব্যের ডাক আসিয়াছে, এই আধি-ব্যাধি-লাঞ্ছিত মরণাহত জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। বৈদিক ঋষিগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলিব, "জীবেম শরদঃ শতম্, পশ্যেম শরদঃ শতম্, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।" আমরাও বিদ্যালয়ে "Play for all, Food for all" প্রচেষ্টা প্রবর্তন করিতে চাই। সমাজকেও এ বিষয়ে তাহার কর্তব্য পালন করিতে হইবে, সমাজের হিতবুদ্ধি জাগাইতে হইবে। প্রত্যেক বড় কাজ, বড় আন্দোলনের প্রারম্ভ বিদ্যালয়েই হইয়া থাকে। সুতরাং "আমরা বাঁচিব" "আমরা শক্তিমান্ হইব" এই আন্দোলনের প্রারম্ভ বিদ্যালয়েই হইবে। আমি জানি আপনারা কাজের চাপে বিব্রত, অভাবে ও উপেক্ষায় অবসন্ন ; কিন্তু বাঁচিবার দাবী, জাতিকে বাঁচাইবার দাবী সকলের আগে। আমাদের ছেলেরা বাঁচিলে—উদ্ভিদের মত নয়, মানুষের মত বাঁচিলে—তবেই ত দেশ তাহাদের শিক্ষার ফলভোগ করিবে। আজ স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি মনে পড়িতেছে—The Gita is better taught on the play ground.

* * * *

বাঙালী শিক্ষক বাঙালী ছেলেকে শিক্ষাদান করেন পরের ভাষায়। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এই পর ভাষার বিভীষিকায় দুরুহ হইয়া উঠে, পড়া ও পড়ানর আনন্দ এবং সজীবতা চলিয়া যায়, শিক্ষা আগ্রহের জিনিষ না হইয়া নিগ্রহের মূর্তি ধারণ করে। বিদ্যার্থীর

মৌলিকতা নষ্ট হইয়া যায়, অকারণ শক্তির অপচয় ও সময়ের অপব্যয় হয়, শিক্ষণীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবার বিষম ব্যাঘাত ঘটে।

ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল Mr. West লিখিয়াছেন, "Men taught through the medium of foreign language, grow up intellectually educated but emotionally sterile". তাঁহার "Bilingualism" গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "The foreign medium prevents a boy from thinking freely; and in not a few cases it makes it impossible for him to think at all". বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দিলে ছেলেদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ব্যাঘাত ঘটে, এবং বহুক্ষেত্রে তাহাদের চিন্তাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

লর্ড রোণাল্‌ড্‌শে তাঁহার "Heart of Aryavarta" গ্রন্থে বাংলা ভাষার শক্তি ও উপযোগিতা সম্বন্ধে একজন সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—Bengali is one of the great expressive languages of the world, capable of being the vehicle of as great things as any speech of men (J. D, Anderson), অর্থাৎ জগতের যে সকল ভাষা ভাব প্রকাশের উপযোগিতায় শ্রেষ্ঠ, বাংলা তাহাদের অন্যতম। গভীর বিষয়ের প্রকাশ-সামর্থ্যে ইহা মানবজাতির যে-কোন ভাষার সমকক্ষ। সুতরাং আমাদের এই মাতৃভাষাকে ছাড়িয়া পরের দুরূহ, উচ্চারণের বিড়ম্বনাপূর্ণ ভাষা কেন আমাদের শিক্ষার বাহন হইবে? ইহা যথার্থই আমাদের পক্ষে বিলাতী মাটী; ইহাতে মৃত্তিকার সরসতা ও সজীবতা নই। আমাদের বাড়ন্ত গাছগুলি এই সিমেণ্টে রস পায় না, ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়। বাংলার

শৈশব ও যৌবন এমনি করিয়া এই সুদীর্ঘকাল শুকাইতেছে, বাংলার শ্যামল হৃদয় এমনি ভাবে অকাল বার্ধক্যে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। এখন ইহাকে মাতৃস্তন্যের সরসতায় সজীব করিতে হইবে। মাতৃভাষায় সকল বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষা হইলে সময় বাঁচিবে, অনর্থক শক্তির অপচয় হইবে না, ছেলেরা আগ্রহ করিয়া কত কিছু শিখিতে চাহিবে, শিক্ষা জীবন্ত ও সার্থক হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ঘাড়ের এই ভূত নামাইতেই হইবে। আপনারা মিলিত কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ করুন, বাংলা দেশ দৃঢ়স্বরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য দাবী করুন।

ইংলণ্ডের বর্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী রাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড ১৯১০ সালে সমস্ত বাংলা দেশ পরিভ্রমণ করে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন,—Excellent raw materials in the young men of Bengal all over the country. বাস্তবিকই বাংলার ছাত্রগণকে পৃথিবীর যে-কোন জাতির ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—তুলনায় মস্তক অবনত কর্‌তে হয় না। বাংলার ছেলেরা অসাধ্য সাধন কর্‌তে পারে। দামোদর বন্যা, খুলনা দুর্ভিক্ষ ও গত বৎসর উত্তর-বঙ্গ প্লাবনের সময় যখন সাহায্যকল্পে তাদের কাছে আমার আবেদন পাঠিয়েছিলাম—দেখেছি বাংলার যুবকবৃন্দ দলে দলে এসে, অসামান্য স্বার্থত্যাগ করে, সূর্যতাপ ও জলকাদার ক্লেশ উপেক্ষা করে, আহার-বিহার, স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে আর্তের সেবায় অগ্রসর হয়েছে। অনেক সময় তাদের স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রমের অনুতাপে সফলতা দেখা যায় নাই সত্য, কিন্তু সে দোষ তাদের নয়—সে দোষ নেতৃবৃন্দের, পরিচালকগণের।

স্বাস্থ্য ও শক্তি

রাজকীয় কৃষি-কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় আমি জোর করিয়া বলিয়াছিলাম যে, জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ, দৈনিক আহার্য দুগ্ধ ও গব্য পদার্থের অভাব। বাঙ্গালোরে ভারত গভর্ণমেন্টের যে আদর্শ গোশালা আছে, তাহা আমি পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। কিসে গোজাতির উন্নতি হয়, দুগ্ধ ও গব্য পদার্থ যথানিয়মে সংগৃহীত ও প্রস্তুত হয়, এই সকল বিষয়ে সাধারণের অজ্ঞতা দূর করাই এই পরীক্ষাগারের কার্য। দোহনের পর দুধ বীজাণুশূন্য (Pasteurise) করা হয়। গোমূত্র, সিমেণ্টের নালা বহিয়া পাত্রে জমা হয় ; চোনায় যথেষ্ট পরিমাণ এমোনিয়া-ঘটিত পদার্থ থাকে, ইহা জমির উত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাঠ্যাবস্থায় এডিনবরায় দেখতাম, স্কচ্ গোয়ালা চোনা, গোবর ও চূণ একত্র মিলাইয়া মাটীতে পুতিয়া রাখিত এবং কয়েক মাস পরে সার হিসাবে ব্যবহার করিত।

তৈলে ভেজাল আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার আর একটি কারণ ; পূর্বে গ্রামে গ্রামে "ঘানি গাছ" ছিল, কলের তৈল বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না। তেল কলের হইলেই যে অশুদ্ধ হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলে সরিষার পরিবর্তে এত সম্ভব ও অসম্ভব ভেজাল চলে যে, তাহা না দেখিলে সহসা প্রত্যয় করিতে মন উঠে না। পাকুড়ের বীজ ভেজাল যে একবার কলিকাতায় সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন।

মেডিক্যাল কলেজের শারীর বিদ্যার ভূতপূর্ব শিক্ষক ডাক্তার ম্যাকে বাঙালীর খাদ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ বাঙালীর খাদ্যে শুধু শ্বেতসারের প্রাচুর্য থাকে, নাইট্রোজেনের ভাগ এত অল্প থাকে যে, তাহাতে দেহ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। শ্বেতসার, প্রোটিন্, শর্করা, স্নেহ ও লবণ জাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে আমাদের খাদ্যবস্তু গঠিত, ইহার মধ্যে শুধু প্রোটীনে নাইট্রোজেন থাকে। খাদ্যের মধ্যে প্রধানতঃ দুধ, ডিম, ডাল, মাছ ও মাংসে প্রোটীন্ থাকে। দুধের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, ডিম অনেকেই খান না। মাংস কিনিবার সঙ্গতি অনেকেরই নাই। বাকী রহিল ডাল ও মাছ। মাছ আমরা বাঙালীরা খাই বটে, কিন্তু অনেক সময়েই শুধু মনকে প্রবোধ দিবার জন্য অথবা সধবার 'সধবাত্ব' বজায় রাখিবার জন্য! আসলে অনেক সময়েই একরাশ মশলা, বাটনা তরকারীর মধ্যে দুই একখানি ক্ষুদ্র মৎস্য-খণ্ড আত্মগোপন করিয়া থাকে, নানান্ কসরতের পর আবিষ্কৃত হইলেও শরীর গঠনের যে বিশেষ সহায়তা করে, তাহা মনে হয় না। কারণ পরিমাণে তাহা অতি অল্প। মোটের উপর আজকাল কলিকাতার ডোবা জল ভরাট করিবার সময় মুন্সিপ্যাল গাড়ী যেমন অনবরত আবর্জনা, রাবিশ ঢালিয়া যায়, অদৃষ্টের বিধানে আমরাও সেইরূপ কোন ক্রমে ক্ষুধা-নিবারণের জন্য কচু ঘেঁচু যাহা সম্মুখে পাই তাহাই উদরে নিক্ষেপ করি।

অবশ্য কচু-ঘেঁচু আহারে যে উপকার হয়, তাহা পরে বলিতেছি। ইহার ফল এই হয় যে, খাদ্যের অধিক ভাগ শরীর গঠন ও সংরক্ষণের কাজে বড় একটা লাগে না, প্রায় সমস্ত অংশই

শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। মেডিক্যাল কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ ডাক্তার কোটস্ বলিয়াছেন, "ওজন অনুপাতে বাঙালী খায় অনেক, কিন্তু খাদ্যের অনুপাতে তাহা সারহীন, শরীর বিশেষ কিছুই পায় না। ফলে এ দেশের কেবল সহরের ড্রেনের সমস্যা অতি জটিল হইয়া দাঁড়ায়।" এই কারণেই একজন বাঙালী ইংরাজের চেয়ে ওজনে কম হইলেও, তাহার পাকস্থলী আয়তনে ইংরাজের পাকস্থলী অপেক্ষা অনেক বড়। বাল্যকাল হইতেই সারশূন্য অথচ পরিমাণে অধিক খাদ্য দ্বারা পাকস্থলী পূর্ণ হওয়ার জন্য পাকস্থলীর পেশী ক্রমশঃ বিস্তৃত হয় এবং স্বতঃ সঙ্কোচধর্ম হারাইয়া ফেলে।

মাদ্রাজের কনূর ইনষ্টিটিউটের লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল ম্যাকক্যারিসন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাঙালী ও মাদ্রাজীর খাদ্য ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায় সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং পাঞ্জাবের খাদ্য সর্বোৎকৃষ্ট। রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই দুই প্রদেশের খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসার স্নেহ প্রভৃতি উপাদানের অনুপাতে নাইট্রোজেনের স্বল্পতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়; দিনের পর দিন শরীরকে প্রোটীন্ খাদ্য হইতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়। আর এই "নাইট্রোজেনের অনাহারের" (nitrogen starvation) ফলেই এই দুই জাতি সারা ভারতে শীর্ণকায় ও দুর্বল।

তরি-তরকারী, খাদ্যশস্য, দুগ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ভাইটামিন নামে এক জাতীয় পদার্থ থাকে। ফলমূলে সাধারণতঃ খোসার মধ্যেই ইহার স্থান, পুরু করিয়া খোসা ফেলিয়া দিলে ভাইটামিনও সঙ্গে

সঙ্গে চলিয়া যায়। আহার্যে যদি শুধু শ্বেতসার, স্নেহ, শর্করা প্রোটীন প্রভৃতি যথোচিত পরিমাণেও থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, পুষ্টিকর আহার সত্ত্বেও শরীর ক্রমশঃ কাহিল (rickety) হইয়া পড়ে এবং স্কার্ভি প্রভৃতি রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়। কয়েক বৎসর হইল, আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন থাকা প্রয়োজন এবং ভাইটামিন অভাবেই শরীর বেরিবেরীতে আক্রান্ত হয় এবং গঠনোন্মুখ দেহ ঠিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। আমরা সাধারণতঃ যাহাদের "ছাতুখোর খোট্টা" বলিয়া উপহাস করি, তাহাদের ভূষিমিশ্রিত লাল আটার মধ্যে (whole meal) ভাইটামিন যথেষ্ট বর্তমান। তাহাদের ক্রোড়পতি পর্যন্ত এই জাঁতা-ভাঙ্গা লাল আটা ছাড়েন না। আর আমাদের চাই সাদা ধবধবে ঢেঁকিছাঁটা চাউল, সফেদ কলের আটা,—অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াই যেন আমরা চাউল আর ময়দার মধ্যে যেটুকু সারপদার্থ আছে, তাহাও বাহির করিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হই। ইহাকে স্বকৃত পাপ, ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা ভিন্ন আর কি বলিব?

মুড়ি, খই, চিড়া প্রভৃতি অতি সুন্দর জলখাবার; আমি নিজে এই সকল খাবার পাইলে আর কিছু চাহি না। মুড়ি দেশী বিস্কুট, ইহাতে শ্বেতসার আংশিকভাবে ডেক্‌ষ্ট্রীণে পরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। আমার মতে মুড়ি ও বিস্কুটে কোনই প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু দামে; অথচ "সভ্যতার" খাতিরে অতিথিকে বিস্কুট না দিয়া মুড়ি দেওয়া চলে না, কারণ মুড়ি দিলে অতিথির অপমান করা হয়। যেখানে চৌদ্দ ছটাক বিস্কুটের দাম আড়াই টাকা

সেই পরিমাণ মুড়ির দাম মাত্র দুই চারি আনা। কিন্তু মুড়ির ন্যায় এক পদার্থ Puffed rice অর্থাৎ বিলাতি মুড়ি বারো আনা পাউণ্ডে কিনিয়া অনায়াসে অতিথির পাতে পরিবেষণ করা যাইতে পারে। আমার শুধু দুঃখ হয় যে, প্রতি বৎসর এত ছেলে রসায়ন শাস্ত্র পড়িতেছে, কিন্তু এই সামান্য সত্যটি বুঝাইয়া দিবার কাহারও সামর্থ্য নাই! তাহার উপর গুড় খাওয়া চলিতে পারে না। কারণ, চিনির তুলনায় গুড় সস্তা অথচ গুড়ে ভাইটামিন লবণজাতীয় পদার্থ পুরা মাত্রায় থাকে, চিনিতে একেবারে অবর্তমান। মুড়ি অথবা চিড়ে এবং উত্তম গুড় সহযোগে যে চাক্‌তি প্রস্তুত হয়, তাহা এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার কাছে অমৃত বলিয়া মনে হয়, অথচ মানিকতলা অঞ্চলে মুড়ি ও চিড়ার দোকান খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে হয়রান হইতে হইয়াছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের শিব মন্দিরের নিকট একটি ছোট দোকান আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাও চলে বোধ হয় আমার মত দুই পাঁচ জন "বিকৃত-মস্তিষ্কের" খেয়ালের ফলে।

ছেলেবেলায় কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে দেখিতাম, অতিথিগণের জন্য মুগ ও বুটের অঙ্কুর, নারিকেল-কোরা, কচি শশা, আখের খণ্ড ইত্যাদির জলপান বিতরণ করা হইত; আজকাল বোধ হয় এ সকল লোপ পাইতেছে। এই সকল জিনিষে ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণ থাকে।

সময়নিষ্ঠা

আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—মানব জাতির প্রতি বিধাতার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান কি? আমি তখনই উত্তর দিয়ে থাকি—মহামূল্য সময়। সময়ের সদ্ব্যয় ও অপব্যয়ের উপরই মানব-জীবনের সার্থকতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। Lord Morley তাঁর Study of Literature নামক পুস্তকে সময়ের কিরূপ সদ্ব্যবহার করা যায় সে কথা বলেছেন। ইংলণ্ডে সামান্য কেরাণী ও শ্রমজীবিগণ পর্যন্ত সময়ের মূল্য বোঝেন; এক মিনিটও হেলায় নষ্ট করেন না। কিন্তু আমরা কাজ না করার কৈফিয়ৎ দিই—সময়ের অভাব, অথচ গল্প-গুজব আড্ডা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। বাস্তবিকই বড় লজ্জার কথা।

অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত—ধ্যান-ধারণার সমতুল্য। ঠাকুর-ঘরে যখন কেউ উপাসনা-নিরত থাকেন, তখন পাছে ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেউ তাঁকে বাধা দিতে যায় না। সেইরূপ কেউ অধ্যয়ন বা চিন্তা-নিরত থাক্‌লে, তাঁকে কোন মতে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। বাধা দিলে কত ক্ষতি হ'তে পারে, আমরা তার ধারণাই করতে পারি না। একটি উদাহরণ দিই—কবি কোলরিজের (Coleridge) Kubla Khan or Vision in a Dream নামক বিখ্যাত কবিতা রচনার কথা। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কবির একটু মরফিয়া সেবন অভ্যাস ছিল। একদিন মরফিয়া সেবন ক'রে আরাম-কেদারায় তিন ঘণ্টা যাপনের পর নিদ্রিতাবস্থায় কবির মনন-শক্তি ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠল, (মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এ কথা স্বীকার করেন)

তিনি স্বপ্নে "কুবলা খাঁ" কবিতার ৩০০।৪০০ ছত্র রচনা কর্‌লেন। নিদ্রার পূর্বে তিনি চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র কুবলা খাঁ সম্বন্ধে কিছু পড়্‌ছিলেন বটে। যাহোক নিদ্রা ভঙ্গের পরই কাগজ কলম দোয়াত নিয়ে কবিতাটি লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। ৫৪ লাইন লিখেছেন এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে কোন লোক তাঁকে কথাবার্তায় এক ঘণ্টা ব্যস্ত রেখে দিলে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এই প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে কবির চিন্তাধারার সূত্র হারিয়ে গেল, আর তার ফলে সেই অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা মাত্র ৫৪ লাইন লিখিত হ'য়ে অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ হ'য়ে রইল।

বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রেরই যুগ ছিল। বঙ্কিম যে কি অপরিশোধ্য ঋণে দেশকে আবদ্ধ ক'রে গেছেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি ডেপুটী ছিলেন; কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে আপন কর্তব্য কখনও অবহেলা করেছেন, এ অভিযোগ কেহ কখনও করে নি। অবসর নিয়ে শেষ জীবনে সীতারাম, আনন্দমঠ প্রভৃতি লিখেছিলেন বটে, কিন্তু কর্মজীবনে তাঁর একদিকে ছিল শ্রমসাধ্য রাজকার্য, অন্যদিকে ততোধিক শ্রমসাধ্য সাহিত্য-সৃষ্টি। এই দুইএর কোনটীর প্রতিই কোন দিন তিনি আপন কর্তব্য বিস্মৃত হননি। আপত্তি উঠ্‌তে পারে—বঙ্কিমের ছিল ঈশ্বরদত্ত শক্তি, যেন ধ্যানে বসে লিখ্‌তেন। সুতরাং তিনি যা করেছেন সাধারণে তা কি ক'রে কর্‌বে? বেশ কথা। আমি তাঁর অনন্যসাধারণ ও অনবদ্য সাহিত্য-সৃষ্টির কথা বল্‌ছি না; সাধারণের যা অনুকরণীয় তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ শ্রমশীলতা। বই লেখা ছাড়া তাঁকে বঙ্গদর্শন সম্পাদন কর্‌তে হ'ত। এই সম্পাদন

কার্যের জন্য তাঁকে সাহিত্য-চর্চা ও রাজ-কার্যের পরেও সময় কর্‌তে হ'ত। কি বিপুল সে চেষ্টা! বঙ্গদর্শন বাংলা দেশে এক নবযুগ আনয়ন করেছিল। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, সমালোচনা, ঐতিহাসিক গবেষণা, সামাজিক সমস্যার বিচার, বিজ্ঞান-রহস্যের পরিচয় প্রভৃতি নানা রস-সম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে বঙ্গদর্শনের সৌন্দর্য হ'য়েছিল।

বাস্তবিক বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর চিত্ত নিত্য নূতন দিকে সাড়া দিয়েছিল। এই পত্রিকা সম্পাদনের জন্য নানা প্রবন্ধ পাঠ ও নির্বাচন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কর্‌তেন। এই জন্য কত দায়িত্ব ছিল এবং কত সময়ই যে তাঁকে ব্যয় কর্‌তে হ'ত, তা একবার ভেবে দেখা উচিত।

যাঁরা অসংখ্য কাজের মধ্যে গুরু পরিশ্রম ক'রে জাতি গঠনের মাল-মশলা যুগিয়ে গেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত দেখেও কি আমরা আমাদের শ্রমবিমুখতার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলতে থাক্‌ব—"আ মশায়, পারিনে, অফিসের কাজ, কখন সময় পাই?"

আচ্ছা, রমেশ দত্ত মহাশয়ের কথা ধরা যাক্‌। তিনি সুরেন বাবু ও বিহারী গুপ্তের সঙ্গে সিভিলিয়ান হ'য়ে বিলাত থেকে দেশে ফির্‌লেন। তারপর বঙ্কিমের পরামর্শে তাঁরই পদানুসরণে কত বাংলা উপন্যাস লিখ্‌লেন। বঙ্কিম ও রমেশ, রবিবাবু ও শরৎবাবু ঔপন্যাসিক হিসাবে কে কত বড় আমি তার হিসাব কর্‌ব না, সে সাধ্য আমার নেই। আমার কথা এই—তখন বঙ্কিমের পরই রমেশ! রমেশচন্দ্র সাহিত্যসেবী; কিন্তু শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর প্রতিভা কা'রও চেয়ে কোন দিকে কম ছিল না। রাজকার্যের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা-

মূলক সন্দর্ভ রচনা ক'রেছিলেন, নানা গবেষণা ক'রে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাহায্যে বেদের বঙ্গানুবাদ ক'রেছিলেন। আশ্চর্য শ্রমশীলতা! ফার্লো নিয়ে বিলাত গিয়ে ১৮১২ খৃঃ হ'তে ১৮৩৩ খৃঃ পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের সনদ (charter) সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যের খাতাপত্র পার্লামেণ্টের দপ্তর থেকে অনুসন্ধান ক'রে, পাঠ ক'রে, আলোচনা ক'রে তিনি Economic History of India এবং India under Victorian Age নামক অপূর্ব ও অমূল্য গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন ক'রেছিলেন। বৈদেশিক রাজশক্তি ও বণিকের চক্রান্তে ভারতের শিল্পবাণিজ্য কি প্রকারে ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে ভারতবাসী দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে নেমে যায়, অধঃপতনের সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাস রমেশচন্দ্রের এই সকল পুস্তক পাঠ কর্‌লে জান্‌তে পারা যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরে কমিশনারের কার্য ক'রেও তিনি কত সাহিত্য, কত ইতিহাস রচনা ক'রে গেছেন, তা ভাব্‌লেও আশ্চর্য হ'তে হয়। এঁদের দৃষ্টান্ত শ্রমবিমুখকে প্রতিনিয়ত লজ্জা দিক্‌।

এইবার নিজ সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলি। বয়স ত প্রায় তিনকুড়ি দশ হল; সময় এগিয়ে আস্‌ছে। আমি চিররুগ্ন। আলবার্ট স্কুলে তখন কেশব সেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুন্‌তাম। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন স্কুলের কর্তা। তিনি ইংরেজী পড়াতেন; তাঁর মত ইংরেজী ভাষার শিক্ষক আজও দুর্লভ। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম। হকারের দোকান থেকে লাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষার বই কিনে পড়্‌তাম। বঙ্গদর্শন আগাগোড়া পড়া যেত। সম্প্রতি গত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে আমি নানা কার্যোপলক্ষে প্রায় ৯০,০০০ মাইল ভ্রমণ ক'রেছি। ছাত্রজীবনেই ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি

আমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। রাসায়নিক হ'লে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস চর্চা করবার সময় আমি পাই। মহীশূরের দেওয়ান সেদিন অভিযোগ ক'রে বল্‌ছিলেন, আমি নাকি বিজ্ঞান ত্যাগ ক'রে খদ্দর ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রচার কার্য আরম্ভ ক'রেছি। বিজ্ঞান ত্যাগ কর্‌ব কেন? বার মাসে বৎসর। প্রতি মাসে ২।৪ দিন খদ্দর প্রচার কর্‌লেই সব ত্যাগ হয়ে গেল? সায়েন্স কলেজে স্যর রাসবিহারী ২১ লক্ষ এবং স্যর তারকনাথ ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে আমাদের হাতে কলেজ স'পে দিয়ে গেছেন। আমরা হচ্ছি কলেজের ট্রাষ্টি।

আমি কি দেশদ্রোহী যে, তাঁহাদের গচ্ছিত ধনের অবহেলায় অপব্যবহার করব?

গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি দার্জিলিংও যাই না, পূজাবকাশে কোথাও নড়ি না। এখন রেলওয়ের যুগ। দেশের দূরপ্রান্তেও ২।৩ দিন অবস্থান ক'রে সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসা যায়। সাধারণে বলেন, একে রুগ্ন শরীর, তার উপর এত পরিশ্রম কি ক'রে করি। প্রকৃত কথা এই যে সময় বেঁধে কাজ কর্‌লে অনেকেই অনেক কাজ সুসম্পন্ন কর্‌তে পারে।

বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম
ও
ভাষা-প্রীতি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫২

বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

ও

ভাষা-প্রীতি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫২

মূল্য—৩॥০